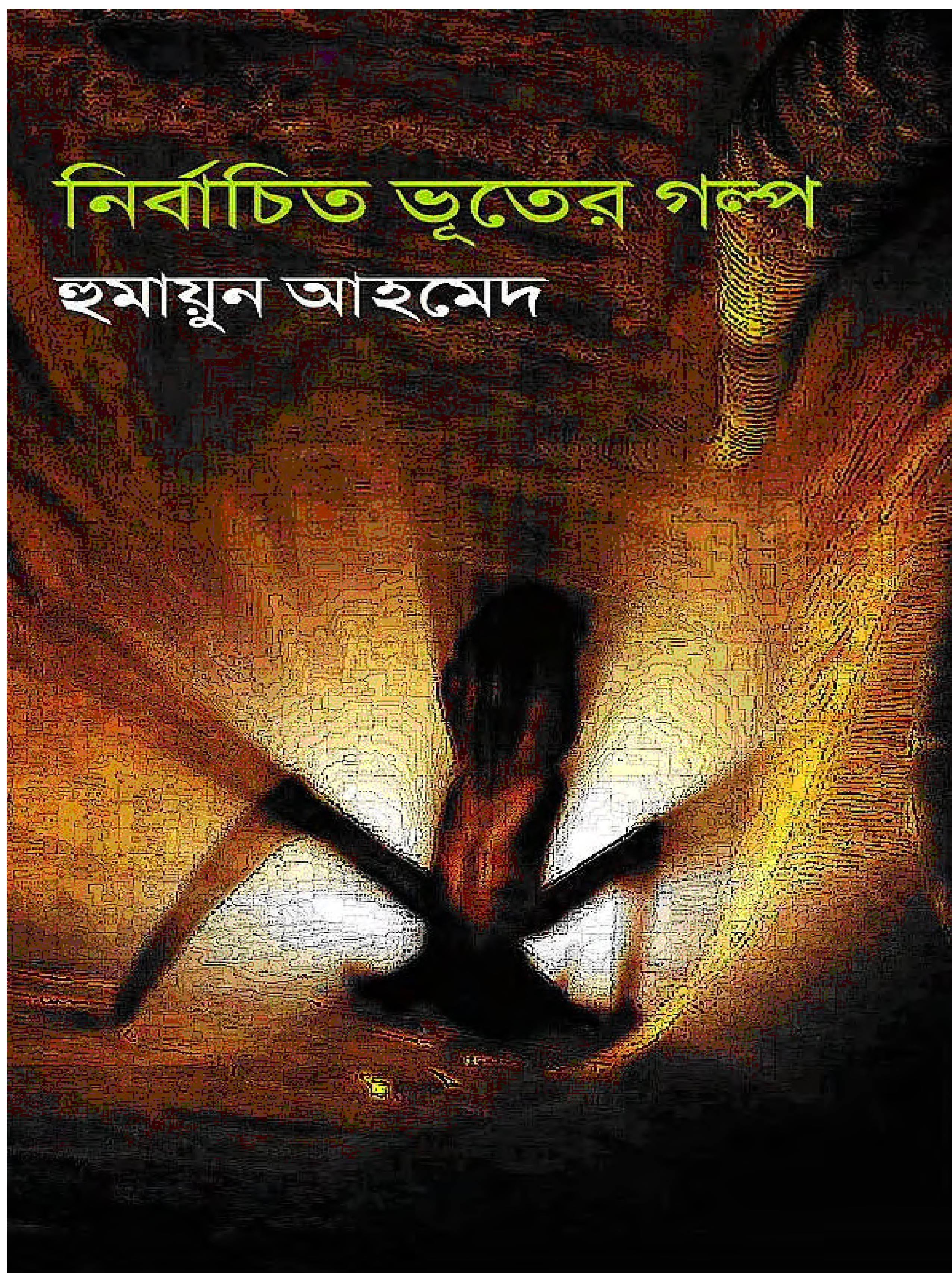
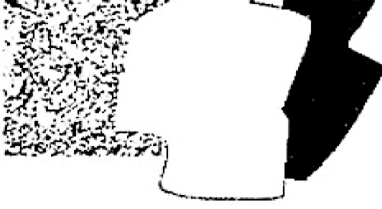

নির্বাচিত ভূতের গল্প
হুমায়ুন আহমেদ



পাথর

'চিত্রা মা, চা-টা উপরে দিয়ে আয়তো।'

চিত্রা বারান্দায় বসে নখ কাটছিল। বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলের একটা নখ ভেঙ্গেছে, ভাঙ্গা নখ 'রিপেয়ার' করা সহজ ব্যাপার না। তার সমস্ত মনযোগ সেই নখে। নখটা এমনভাবে কাটতে হবে যেন ভাঙ্গাটা চোখে না পড়ে। চিত্রা মা'র দিকে না তাকিয়েই বলল, দেখছ না মা একটা কাজ করছি।

সুরমা বিরক্ত গলায় বললেন, কাজটা এক মিনিট পরে করলে হয় না?

চিত্রা বলল, হয় না। উপরে চা নিয়ে যাওয়ার চেয়ে আমার কাজটা অনেক বেশি জরুরী। তা ছাড়া উপরে চা নিয়ে যেতে আমার ভাল লাগে না।

সুরমা অবাক হয়ে বললেন, কেন?

'জাবেদ চাচা সারাক্ষণ জ্ঞানের কথা বলেন। পড়া জিজ্ঞেস করেন। ইংলিশ ট্রানস্লেশন জিজ্ঞেস করেন। আমার অসহ্য লাগে।'

'তুইতো তাঁর সঙ্গে বেশ হাসিমুখেই কথা বলিস।'

'আমি সবার সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলি। অপছন্দের মানুষদের সঙ্গে আরো বেশি হাসি মুখে বলি, যাতে তারা বুঝতে না পারে। আমি খুব চমৎকার অভিনেত্রী। যাদের সঙ্গে আমি খারাপভাবে কথা বলি— বুঝতে হবে তাদের আমি খুব পছন্দ করি। যেমন তুমি।'

সুরমা বিরক্ত মুখে চায়ের কাপ নিয়ে চলে যাচ্ছেন। সকাল বেলার এই কাজের সময়ে চিত্রার বকবকানি শোনার কোন অর্থ হয় না। মেয়েটার কথাবার্তা কাজ কর্মের কোন ঠিক ঠিকানা নাই। বারান্দায় বসে নখ কাটছে। কাটা নখ ছড়িয়ে থাকবে— সে উঠে চলে যাবে।

চা ঠাণ্ডা হচ্ছে। সুরমা উপরে পাঠানোর কোন ব্যবস্থা করতে পারছেন না। কাজের মেয়েটার জ্বর এসেছে। সে কাথামুড়ি দিয়ে কোঁ কোঁ করছে। রশীদকে পাঠিয়েছেন বাজারে। এক কাপ চা উপরে পাঠানোর লোকের অভাবে নষ্ট হবে? তাঁর মনটা খুঁত খুঁত করছে। অপচয় তাঁর একেবারেই সহ্য হয় না। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। চা তাঁর পছন্দের পানীয় না। চা খাবার পর মুখ মিষ্টি হয়ে থাকে। মিষ্টি ভাবটা কিছুতেই যায় না।

চিত্রা নখ কাটা শেষ হয়েছে। তার মুখ হাসি হাসি। তার অভিনয়টা ভাল হয়েছে। মা সত্যি সত্যি ধরে নিয়েছেন সে জোবেদ চাচাকে খুবই অপছন্দ করে। সামান্য এক কাপ চাও সে উপরে নিয়ে যেতে রাজি না। অথচ সে ছটফট করছে কারণ এগারোটা প্রায় বাজে এখনো অদ্ভুত মানুষটার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। এখন সে নিশ্চিন্ত মনে চা নিয়ে উপরে যেতে পারবে। খুব কম করে হলেও এক ঘন্টা কথা বলতে পারবে। চিত্রা রান্নাঘরে ঢুকল। বিরক্ত বিরক্ত মুখ করে বলল—

'মা চা দাও। নিয়ে যাচ্ছি।'

সুরমা গম্ভীর গলায় বললেন, তোকে নিতে হবে না।

'অন্য একজনের চা তুমি চুকচুক করে খেয়ে ফেলছ আশ্চর্য!'

'শুধু শুধু কথা বলিসনাতো।'

চিত্রা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, মা শোন, আমি এক ঘন্টার জন্যে ছাদে যাচ্ছি। ছাদে হাঁটাহাঁটি করব। এই এক ঘন্টায় কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। আর শোন তুমি আরেক কাপ চা বানিয়ে দাও— আমি জ্ঞানী চাচার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি।

'তোকে চা দিয়ে আসতে হবে না।'

'অবশ্যই হবে। না দেয়া পর্যন্ত আমার মনে একটা অপরাধবোধ কাজ করবে। সারাক্ষণ মনে হবে আহা আমার জন্যে বেচারা চা খাওয়া থেকে বঞ্চিত হল। অপরাধ বোধ থেকে হবে গিল্ট কমপ্লেক্স। সেখান থেকে জটিল জটিল সব মনের রোগ তৈরি হবে। তারপর একদিন দেখা যাবে আমি ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে গেছি। আমার মাথার ঘিলু চারদিকে ছিটকে পরে আছে। ইত্যাদি। ইত্যাদি।'

'তুই সারাক্ষণ এত কথা বলিস কিভাবে? ছোট বেলায় তো এ রকম ছিলিনা?'

'ছোটবেলায় কি রকম ছিলাম, হাবা টাইপের?'

'আর কথা বলিসনাতো।'

'তুমি আমার সামনে থেকে সরোতো মা। আমি চা বানাব। আমার নিজেরো চা খেতে ইচ্ছে করছে। জ্ঞানী চাচার জন্যেও এক কাপ নিয়ে যাব। অপরাধবোধ থেকে মুক্ত হব। ভাল কথা মা—আমার হাতের কাটা নখগুলি সারা বারান্দায় ছড়ানো—কাউকে দিয়ে পরিষ্কার করিও নয়ত তুমিই আমার সঙ্গে খ্যাঁচ খ্যাঁচ করবে।'

'চুপ করতো।'

চিত্রা খিলখিল করে হেসে উঠল। সে চায়ের কাপে চা ঢালছিল। হাসির কারণে চা চারদিকে ছড়িয়ে গেল। ধমক দেয়ার বদলে সুরমা মুগ্ধ চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটা এত সুন্দর! পিঠময় চুল ছড়িয়ে সে বসে আছে- ঘর আলো হয়ে আছে। সুরমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। এত সুন্দর হওয়া ভাল না।

'মা!'

'কি?'

'তোমার কি ধারণা— আমাদের জ্ঞানী চাচা বোকা না বুদ্ধিমান?'

'বোকা হবে কেন? এসব কি ধরণের কথা?'

'একমাত্র বোকারাই সারাক্ষণ জ্ঞানীর মত কথা বলে। এই জন্যেই আমার ধারণা

তিনি বেশ বোকা।'

'শুধু চা নিয়ে যাচ্ছিস কেন বিসকিট নিয়ে যা।'

'আমি বিসকিট ফিসকিট নিতে পারব না।'

চিত্রা চা নিয়ে উঠে চলে গেল। সুরমা গেলেন বারান্দায় ছড়িয়ে থাকা নখ পরিষ্কার করতে।

বারান্দা ঝকঝকে পরিষ্কার নখের একটা কণাও কোথাও পড়ে নেই। মেয়েটা কি যে করে। মায়ের সঙ্গেও ফাজলামী। রশীদ বাজার নিয়ে এসেছে। তিনি বাজার তুলতে গেলেন। রশীদকে দিয়ে একটা প্লেটে করে কয়েকটা বিসকিটও উপরে পাঠাতে হবে। কথাটা মনে থাকলে হয়। তাঁর কিছুই মনে থাকে না। বাজার তুলতে তুলতে আসল কথাটাই ভুলে যাবেন। পুঁই শাকের বড় বড় পাতা আনতে বলেছিলেন। এনেছে কি না কে জানে? হয়ত ভুলে বসে আছে। চিত্রার বাবা ইলিশপাতুরি খেতে চেয়েছিলেন। সরিষাও আনা দরকার ছিল। পুরানো সরিষায় তিতকুট ভাব হয়। পাতুরি বানালে জোবেদ সাহেবকে পাঠাতে হবে। ভাল মন্দ রান্নার সময় ভদ্রলোকের কথা মনে হয়—শেষ পর্যন্ত পাঠানো হয় না। আসল সময়ে ভুলে যান। সুরমা'র মনে হল ডায়াবেটিসের সঙ্গে জরুরী বিষয় ভুলে যাবার একটা সম্পর্ক আছে। ডায়াবেটিস ধরা পরার পর থেকে এ রকম হচ্ছে। না আজ জোবেদ সাহেবকে খাবার পাঠাতেই হবে।

জোবেদ আলি সুরমাদের তিন তলা বাড়ির ছাদে থাকেন। ছাদে চিত্রার বাবা আজীজ সাহেব বাথরুম সহ একটা ঘর বানিয়ে ছিলেন। গেষ্ট রুম। গেষ্ট এলে ছাদে থাকবে মূল বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না। মাঝে মাঝে নিজেরাও থাকবেন। বৃষ্টি বাদলার দিনে ছাদের চিলেকোঠায় থাকতে ভালই লাগে। সেই পরিকল্পনা কাজে লাগলো না আজীজ সাহেবের মাথায় অর্থকরী পরিকল্পনা খেলা করতে লাগল। ছাদের ঘরটা ভাড়া দিলে কেমন হয়। নির্ঝনঝাট টাইপের ভাড়াটে পাওয়া গেলে প্রতি মাসে হেসে খেলে দু'হাজার টাকা পাওয়া যাবে— বছরে চব্বিশ হাজার, দশ বছরে দুইলাখ চল্লিশ হাজার। আজীজ সাহেব এক রুম ভাড়া হবে এমন একটা বিজ্ঞাপন দিলেন। বর্তমান ভাড়াটে জোবেদ আলি সেই বিজ্ঞাপনের ফসল। ভদ্রলোকের বয়স তিপ্পান্ন। ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন। ভাল না লাগায় ছেড়ে দিয়েছেন। বর্তমানে বই পড়া এবং লেখালেখি ছাড়া কিছুই করেন না। এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে হাসিমুখে বলেন, যেভাবে বেঁচে আছি এইভাবে আরো দশ বছর বেঁচে থাকার মত অর্থ আমার আছে। দশ বছরের বেশি বেঁচে থাকব বলে মনে হয় না। যদি বেঁচে থাকি তখন দেখা যাবে।

আদর্শ ভাড়াটে বলে যদি পৃথিবীতে কিছু থেকে থাকে জোবেদ আলি তাই। তিনি কোথাও যান না, কেউ তাঁর কাছে আসে না। দুপুর বা মধ্যরাতে হঠাৎ টেলিফোন করে কেউ বলে না—"আপনাদের ছাদে যে ভদ্রলোক থাকেন জোবেদ আলি তাঁকে একটু ডেকে দিন না।" শুরুতে আজীজ সাহেব বলে দিয়েছিলেন—ভাই মাসের দু' তারিখে ভাড়া দিয়ে দেবেন। এক বছর হয়ে গেল জোবেদ আলি তাই করছেন খামে ভর্তি করে কুড়িটা একশ' টাকার নোট দিচ্ছেন। প্রতিটি নোট নতুন। কোন ময়লা নোট বা স্কচটেপ লাগানো নোট তার মধ্যে নেই। ভাড়াটের নানান অভিযোগ থাকে-এই ভদ্রলোকের কোন অভিযোগও নেই। একবার পানির মেশিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিন দিন

পানি ছিল না। তিনি কাউকে কিছু বলেন নি। একতলা থেকে বালতি করে পানি এনেছেন। সুরমা দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছিলেন। চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন, একি আপনি পানি তুলবেন কেন? আমার ঘরে তিনটা কাজের মানুষ, বললেই পানি তুলে দেয়। জোবেদ আলি বলেছিলেন—ভাবী, আমি নিজেও একজন কাজের মানুষ। সামান্য এক বালতি পানি উপরে তোলার সামর্থ আমার আছে। যেদিন থাকবে না সেদিন আপনাকে বলব।

আজীজ সাহেব পৃথিবীর কোন মানুষকে বিশ্বাস করেন না, পছন্দও করেন না। তাঁর ধারণা আল্লাহ্‌তালা মানুষকে বদ হিসেবে বানিয়েছেন। ভাল যা হয় নিজের চেষ্টায় হয়— কিছুদিন ভাল থাকার পর আবার নিজের বদ ফরমে ফিরে যায়। সেই আজীজ সাহেবেরও ধারণা— জোবেদ আলি মানুষটা খারাপ না। সুরমা পৃথিবীর সব মানুষকে বিশ্বাস করেন। তাঁর ধারণা জোবেদ আলি মানুষ হিসেবে শুধু ভাল না, অসাধারণ ভাল। শুধু একটু দুঃখি। তাতো হবেই ভাল মানুষরা দুঃখি দুঃখি হয়। ভদ্রলোকের একটা মাত্র মেয়ে ইন্টারমিডিয়েট পড়তে পড়তে বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে চলে গেল ভার্জিনিয়া। বাবা একা পরে রইল দেশ। বাবা এবং মেয়ের আর দেখা হবে কিনা কে জানে? সুরমা একবার কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলেন— আচ্ছা ভাই স্ত্রী মারা যাবার পর আপনি আবার বিয়ে করলেন না কেন? বিয়ে করলেতো আর এই কষ্টটা হত না। একা একা পড়ে আছেন ভাবতেই খারাপ লাগে।

ভদ্রলোক হাসিমুখে বলেছেন- ভাবী এটা একটা বড় ধরণের বোকামী হয়েছে। ব্যাপারটা আপনাকে বলি- আমার মেয়ের জন্মের পরপর স্ত্রী খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। অসুস্থ অবস্থায় এক রাতে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলল, শোন তুমি আমাকে একটা কথা দাও, যদি আমি মরে টরে যাই তুমি কিন্তু বিয়ে করতে পারবে না। আমি ঘুমের ঘোরে ছিলাম— বলে ফেললাম, আচ্ছা। বলেই ফেঁসে গেছি। বেচারী তার মাসখানিক পর মারা গেল আমি ঝুলে গেলাম। হা হা হা।

সুরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, হাসছেন কেন? এর মধ্যে হাসির কি আছে?

"ঘুমের ঘোরে একটা কথা বলে কেমন ফেঁসে গেলাম দেখেন না। এই জন্যই হাসছি।'

'ভাই আপনি বড়ই আশ্চর্য লোক।'

'আমি মোটেই আশ্চর্য লোক না ভাবী, আমি খুবই সাধারণ লোক। বেশি সাধারণ বলেই বোধহয় আশ্চর্য মনে হয়।

'আপনার স্ত্রী কি খুব সুন্দরী ছিলেন?'

'সুন্দরী ছিল কিনা বলতে পারছি না, তবে অপুষ্টি জনিত কারণে বাঙ্গালী মেয়েদের চেহারায় একটা মায়া মায়া ভাব থাকে। সেই মায়া ভাবটা ডবল পরিমাণে ছিল এইটুকু বলতে পারি।'

'তাঁর ছবি আছে আপনার কাছে?'

'আমার কাছে নেই। আমার মেয়ের কাছে আছে। মা'র সব ছবি তার কাছে।'

জোবেদ আলির প্রতি মায়ায় সুরমার হৃদয় দ্রবীভূত হল। বারবার মনে হল— ইস মানুষটার জন্যে কিছু যদি করা যেত। যতই দিন যাচ্ছে সেই মায়া বাড়ছে।

চিত্রা চায়ের কাপ হাতে জোবেদ আলি সাহেবের ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে আছে। তার কপালে ঘাম। সে এক ধরণের অস্থিরতা বোধ করছে যে অস্থিরতার কারণটাও তার কাছে ঠিক স্পষ্ট নয়। জোবেদ আলি চৌকিতে বসে আছেন। তাঁর পিঠ দেয়ালে। পরণে লুঙ্গি ও ফুল হাতা সার্ট। ভদ্রলোকের অনেক বিচিত্র অভ্যাসের একটি হচ্ছে ফুলহাতা শার্ট ছাড়া তিনি পরেন না। চিত্রার মনে হল-"ইস ইনাকে কি সুন্দর লাগছে।" এটা মনে হবার জন্যে সে লজ্জিতও হল না, অপ্রস্তুতও বোধ করল না।

অথচ প্রথমদিন মানুষটাকে দেখে খুব রাগ লেগেছিল। বাইরের উটকো একজন মানুষ ছাদের ঘরে পড়ে থাকবে। যখন তখন ছাদে আসা যাবে না। বৃষ্টিতে ছাদে গোসল করা যাবে না। বাবার সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক করা যাবে না। বাবা কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে বলবেন, যা বোঝ না তা নিয়ে তর্ক করবে না। তোমার অভ্যাস হয়েছে তোমার মা'র মত না বোঝে তর্ক।

চিত্রা বাবাকে বলেনি জোবেদ নামের মানুষটাকে কিছু কঠিন কথা শুনাতে গেছে। কঠিন কথাও ঠিক না- অবহেলা সূচক কিছু কথা। যা থেকে মানুষটা ধরে নেবে- এখানে তার বাস সুখকর কিছু হবে না।

লোকটা চেয়ারে কাত হয়ে শুয়ে বই পড়ছিল এবং পা নাচাচ্ছিল। চিত্রাকে দেখে পা নাচানোও বন্ধ করল না, বই থেকেও চোখ তুললনা। গম্ভীর গলায় বলল, কেমন আছ চিত্রা?

লোকটার পক্ষে তার নাম জানা বিচিত্র কিছু না। নামতো জানতেই পারে। হয়ত কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে। তারপরেও প্রথম আলাপেই পরিচিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করা, কেমন আছ চিত্রা, খুবই আশ্চর্যজনক।

'এসো ভেতরে এসো। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকাটা খুবই অলক্ষণ।'

'অলক্ষণ কেন?'

'প্রাচীন বাংলার বিশ্বাস- যে মেয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে তার ঘরে সুজন ঢুকে না।'

চিত্রা দরজা ছেড়ে ঘরে এসে ঢুকল। এবং বেশ সহজ ভাবেই চৌকির উপর বসল। জোবেদ আলি নরম গলায় বললেন, পরীক্ষা কেমন হয়েছে?

'ভাল, শুধু ইংরেজীটা খারাপ হয়েছে।'

'ইংরেজী খারাপ হলে কিছু যায় আসে না। ইংরেজী বিদেশী ভাষা। বাংলাটা ভাল হলেই হল। ইংরেজী খারাপ হওয়া ক্ষমা করা যায়। বাংলা খারাপ হওয়া ক্ষমার অযোগ্য।'

'আমার বাংলাও খারাপ হয়েছে।'

'সেকি?'

'আসলে আমার সব পরীক্ষাই খারাপ হয়েছে। তবে বাসায় কাউকে কিছু বলি নি।

বাসার সবাই জানে আমার সব পরীক্ষা ভাল হয়েছে। শুধু ইংরেজীটা একটু খারাপ হয়েছে। আমি যা বলি সবাই আবার তা বিশ্বাস করে। কারণ আমি হচ্ছি খুব ভাল অভিনেত্রী।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি।'

'মাঝে মাঝে আমার নিজের অভিনয় দেখে মনে হয় আমি সুবর্না মুস্তফার চেয়েও ভাল অভিনয় করি। আমার চেহারাটা যদি আরেকটু মিষ্টি হত তাহলে টিভিতে যেতাম।'

'তোমার চেহারা মিষ্টি না?'

'জ্বি না।'

'বুঝলে কি করে চেহারা মিষ্টি না?'

'আমাকে রাতে কখনো পিপড়ায় কামড়ায় না। আমি মিষ্টি হলে রাতে নিশ্চয়ই পিপড়ায় কামড়াতো।'

জোবেদ আলি হো হো করে হেসে ফেললেন। হাসির উচ্ছাসে তার হাত থেকে বই পড়ে গেল। চিত্রা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। তার সামান্য রসিকতায় একটা মানুষ এত হাসতে পারে সে কল্পনাও করেনি। চিত্রা বলল, চাচা আমি যাই। জোবেদ আলি বললেন, অসম্ভব তুমি এখন যেতেই পারবে না। তোমাকে কম করে হলেও আরো পাঁচ মিনিট থাকতে হবে। আসলে আজ সকাল থেকে আমার মনটা খুব খারাপ ছিল, তোমার সঙ্গে কথা বলে মনটা ভাল হয়েছে। আরেকটু ভাল করে দিয়ে যাও।

চিত্রা বলল, আমি কারোর মন ভাল করতে পারি না। আমি যা পারি তা হচ্ছে মন রাগিয়ে দেয়া। যেই আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে সেই রেগে যায়।

'আচ্ছা বেশ তুমি আমাকে রাগিয়ে দিয়ে যাও— দেখি কেমন রাগাতে পার।' তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দেয় হল-

চিত্রা পাঁচ মিনিটের জন্যে বসে শেষ পর্যন্ত পুরো এক ঘন্টা থাকল। সে আরো কিছুক্ষণ থাকতো কিন্তু সুরমা রশীদকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন। চিত্রার দিকে তাকিয়ে বললেন, এতক্ষণ কি করছিলি?

চিত্রা বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল, মা শোন কাকে আমাদের বাড়িতে এনে ঢুকিয়েছ?

সুরমা বললেন, কেন?

'আমি ভদ্রতা করে দেখা করতে গেলাম উনি আমাকে ইংরেজী ট্রানস্লেশন ধরলেন। তারপর উপদেশ আর বক্তৃতা। অসহ্য। বাবাকে বলে উনাকে তাড়াবার ব্যবস্থা করবো মা। ঐ লোকের জন্য আমার ছাদে হাঁটা বন্ধ হয়ে গেল।'

'তুই তোর মত ছাদে যাবি।'

'অসম্ভব! আমি আর ভুলেও ছাদে যাব না।'

আসলে এক অর্থে চিত্রার ছাদে যাওয়ার সেদিন থেকেই শুরু। তারপর এক রাতে সে আশ্চর্য সুন্দর এবং একই সঙ্গে খুবই ভয়ংকর একটা স্বপ্ন দেখল। সে দেখল সে হাঁটছে, ফুটফুটে একটা বাচ্চা মেয়ের হাত ধরে হাঁটছে। সেই বাচ্চা মেয়েটা জাপানী পুতুলের মত সুন্দর। জোবেদ আলি নামের মানুষটা বাচ্চা মেয়ের অন্য হাত ধরে আছে। সেই মানুষটা বাচ্চা মেয়েটার বাবা, এবং সে মেয়েটার মা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ লজ্জা। কি লজ্জা।

তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সারারাত সে জেগে রইল।

নিজেকে মনে হচ্ছিল কুৎসিত একটা পোকা। সারারাত সে একটা পোকার মতই শরীর গুটিয়ে শুয়েছিল। শুয়ে শুয়েই সে ফজরের আজান শুনল। তার মা ঘুম ভেঙ্গে দরজা খুলছেন তাও বুঝল। এবং প্রথমবারের মত মনে হল— মা রোজ এত ভোরে উঠে? আশ্চর্যতো! সে নিজেও বিছানা ছেড়ে নামল। দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে দেখে বারান্দার জলচৌকিতে সুরমা নামাজ পড়ছেন। বারান্দার এই অংশটা চিকের পর্দায় ঢাকা। খুব নিরিবিলি।

সুরমা নামাজ শেষ করে বিস্মিত হয়ে বললেন, কি হয়েছে? চিত্রা বলল, কিছু হয়নি। ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

'এত সকালে ঘুম ভাঙ্গল কেন?'

'তুমি এমন ভাবে কথা বলছ যেন সকালে ঘুম ভাঙ্গাটা অপরাধ।'

'অপরাধ হবে কেন? সকালে ঘুম ভাঙ্গাটাতো খুব ভাল কথা। ফজরের দু'রাকাত নামাজ পড়ে ফেলিস দেখবি সারাটা দিন কত ভাল যাবে। শরীর থাকবে ফ্রেস। আজ থেকে শুরু কর না।'

'সব সময় উপদেশ দিওনাতো মা। অসহ্য লাগে। আজ ভোরবেলায় উঠেছি বলেকি রোজ ভোরবেলায় উঠব? কাল থেকে আবার আগের মত দশটার সময় ঘুম ভাঙ্গব।'

'তুই যাচ্ছিস কোথায়?

'ছাদে। মর্নিং ওয়ার্ক করব।'

'তোর চোখ এমন লাল দেখাচ্ছে কেন?'

'ভোরবেলা সবার চোখই লাল দেখায়। তোমার চোখও লাল। বাম চোখটা বেশি। ডানটা কম।'

চিত্রা ছাদে উঠে গেল।

আশ্চর্য জোবেদ আলি সাহেব ছাদে হাঁটছেন। তাঁর পরণে ফুল হাতা সার্ট। ধবধবে সাদা লুঙ্গী। সার্টের রঙ খয়েরী। খয়েরী রঙের খানিকটা মুখে এসে পড়েছে। তাঁকে কেমন যেন বিষন্ন দেখাচ্ছে।

চিত্রা খুব সহজ ভঙ্গিতে বলল, ছাদে কি করছেন?

জোবেদ আলি বললেন, হাঁটছি।

'আপনি রোজ এত ভোরে উঠেন?'

'না। আজ বাধ্য হয়ে উঠেছি। দাঁতের ব্যথায় রাতে ঘুম হয়নি। দেখ গাল ফুলে কি হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সের অনেক যন্ত্রনা।'

'দাঁতের ব্যথাটা কি খুব বেশি?'

'এখন একটু কম। সব ব্যথাই দিনে কমে যায়। রাতে বাড়ে। তুমি কি রোজ এত ভোরে ওঠ?'

'আমি সকাল দশটার আগে কখনো বিছানা থেকে নামি না।'

'আজ নামলে যে?'

চিত্রা হাসতে হাসতে বলল, কাল রাতে আমার এক ফোঁটা ঘুম হয়নি। এখন ঘুম পাচ্ছে। ঠিক করেছি ছাদে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে শুয়ে পড়ব।

'কাল রাতে ঘুম হয়নি কেন?

'সত্যি জানতে চান?'

'জানতে চাই এইটুকু বলতে পারি : সত্যি জানতে চাই, না মিথ্যা জানতে চাই তা বলতে পারি না।'

'কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি কারণ কাল রাতে আমি টের পেলাম একজন মানুষকে আমি প্রচণ্ড রকম ভালবাসি। আপনি কি আমার কথায় অস্বস্তি বোধ করছেন'?

'অস্বস্তি বোধ করব কেন? তোমার বর্তমান সময়টা প্রেমে পরার জন্যে আদর্শ সময়। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা হয়ে গেছে, কিচ্ছু করার নেই-এই সময় প্রেমে পরবেনাতো কখন পরবে? প্রেমে কি একা একা পরেছ না দু'জন মিলে পরেছ?'

'আপনি এমন ভাবে কথা বলছেন যেন প্রেমে পরাটা খালে পরে যাবার মত।'

'অনেকটা সে রকমই। কেউ কেউ এমন খালে পরে সেখানে হাঁটুপানি। সমস্যা হয় না। খাল থেকে উঠে আসতে পারে। আবার কোন কোন খালে অতলান্তিক পানি। উঠার উপায় নেই। সাঁতার জানলেও লাভ হয় না। কতক্ষণ আর সাঁতার কাটবে'? এক সময় না এক সময় ডুবতে হবেই।

চিত্রা বলল, আবার কোন খালে পানি নেই। শুধুই কাদা। সেই খালে পরা মানে নোংরা কাদায় মাখামাখি হওয়া।

'ভাল বলেছ। খুব গুছিয়ে বলছ।'

'আপনার সঙ্গে থেকে আর কিছু শিখি বা না শিখি গুছিয়ে কথা বলা শিখেছি।'

'তাওতো কিছু শিখলে। ভালটা মানুষ সহজে শিখতে পারে না। মন্দটা শিখে ফেলে। আমার মন্দ কিছু শেখনি?'

'আপনার মন্দ কি আছে?'

'অসংখ্য। প্রথম হল আলস্য। আমার মত অলস মানুষ তুমি তিন ভূবনে পাবে না।'

'অলস কোথায়? আপনি দিন রাত বই পড়ছেন। লিখছেন।'

'আলস্যটাকে আড়াল রাখার এ হচ্ছে হাস্যকর একটা চেষ্টা। লোকে ভাববে অনেক কাজ করা হচ্ছে আসলে লবডঙ্গা।

'লবডঙ্গা কি?'

'লবডঙ্গা হচ্ছে নব ডংকা শব্দের অপভ্রংশ। নব ডংকা মানেতো জানই নতুন ঢোল। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না প্রচন্ড ঢোলের শব্দ হচ্ছে, সবাই ভাবছে না জানি কত কাজ হচ্ছে আসলে ঢোল বাজছে।'

'আমি এখন যাচ্ছি।'

' কি করবে ঘুমুবে?'

'আমার মাথা ধরে আছে। প্রথমে কড়া এক কাপ চা খেয়ে মাথা ধরাটা কমাব তারপর দু'টা ঘুমের অষুধ খেয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবব কি করা যায়।'

'কি করা যায় মানে?'

'একটা মানুষকে যে আমি প্রচন্ড রকম পছন্দ করি তাকে কি করে সেই খবরটা দেয়া যায় তাই ভাবব। আপনিতো খুব জ্ঞানী মানুষ আপনার কি কোন সাজেশান আছে?'

'তাকে চিঠি লিখ। সুন্দর করে গুছিয়ে চিঠি লেখ।'

'অসম্ভব। আমি চিঠি লিখতে পারব না- আমার লজ্জা লাগবে।'

'মুখে বলা কি সম্ভব ধর টেলিফোনে জানিয়ে দিলে।'

'না।'

'আমিতো আর কোন পথ দেখছি না।'

'আপনার ধারণা চিঠি লিখে জানানোই সবচে ভাল।'

'হ্যা।'

'তারপর সে যদি সেই চিঠি সবাইকে দেখিয়ে বেড়ায় তখন কি **হবে**?'

'খানিকটা রিস্কতো নিতেই হবে।'

'আমি চিঠি লিখতে পারি না। আমি ভাল আছি তুমি কেমন আছ এই দু'লাইন লেখার পর আমার চিঠি শেষ হয়ে যায়।'

তাহলে এক কাজ কর রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ধার নাও। রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতা থেকে কয়েক লাইন লিখে পাঠিয়ে দাও। এমন কিছু লাইন বের কর যাতে তোমার মনের ভাব প্রকাশিত হয়।'

'আমি পারব না। আপনি বের করে দিন।'

লেখ-

'প্রহর শেষের আলোয় সেদিন চৈত্রমাস

তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ।'

লেখার সময় খেয়াল রাখবে যেন বানান ভুল না হয়। প্রেমপত্রে বানান ভুল থাকা অমার্জনীয় অপরাধ।'

'বানান ভুল হবে না। চিঠি লিখতে না পারলেও আমি বানান খুব ভাল জানি।'

চিত্রা ছাদ থেকে নেমে নিজেই চা বানিয়ে খেল। মা'কে গিয়ে বলল- মা শোন, আমি এখন চারটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুম দেব। খবর্দার আমাকে নাশতা খাবার জন্যে ডাকাডাকি করবে না। আমি একেবারে দুপুরবেলা উঠে ভাত খাব।'

সুরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমুতে হবে কেন?

চিত্রা হাই তুলতে তুলতে বলল, আমি ঠিক করেছি একগাদা ঘুমের অষুধ খেয়ে মারা যাব। আজ তার একটা রিহার্সেল।

'তুই সব সময় এমন পাগলের মত কথা বলিস না।'

'আমি শুধু পাগলের মত কথাই বলি না, পাগলের মত কাজও করি। মা রশীদকে তুমি আমার ঘরে একটু পাঠাওতো।'

'কেন?'

'কাজ আছে।'

চিত্রা নিজের ঘরে ঢুকে চারটা ঘুমের ট্যাবলেট খেল। তারপর ড্রয়ার থেকে কলম বের করে গোটা গোটা হরফে লিখল-

প্রহর শেষের আলোয় রাঙ্গা সেদিন চৈত্রমাস।

তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।

কাগজটা ভাজ করে রশীদের হাতে দিয়ে বলল- 'রশীদ তুই এ কাগজটা জোবেদ

চাচার হাতে দিয়ে আয়। এক্ষুনী যা। কাগজটা দিয়ে এসে আমাকে খবর দিবি কাগজ দিয়ে এসেছিস। হাবার মত এরকম হা করে থাকবি না। মুখ বন্ধ করে।'

চায়ের কাপ হাতে চিত্রা দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ হল দাঁড়িয়ে আছে? পাঁচমিনিট? দশমিনিট? নাকি তার চেয়েও বেশী। চা সম্ভবত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঠাণ্ডাই ভাল। জোবেদ চাচা ঠাণ্ডা চা খান। চিত্রা তার জীবনে এই প্রথম একটা মানুষ পেল যে চা ঠাণ্ডা করে খায়। চিত্রা টুক টুক করে দরজায় দু'বার টোকা দিল।

জোবেদ আলি বই থেকে মুখ না তুলেই বললেন, ভেতরে এসো। সাত মিনিট দেরী হল যে?

'দেরী মানে?'

'আমি জানতাম তুমি আমার ঘরে ঠিক এগারোটার সময় চা নিয়ে আসবে। এখন বাজছে এগারোটা সাত। কাজেই তুমি সাত মিনিট দেরী করছ।'

'আমি ঠিক এগারোটার সময় আসব আপনাকে কে বলল'?'

'আমার সিক্সথ সেন্স বলেছে।'

'উফ কেন যে মিথ্যা কথা বলেন। আপনি কি ভেবেছেন আপনার মিথ্যা কথা শুনে আমি খুশি হব?'

'আমি যে কথাটা বললাম সেটা যে মিথ্যা না তা কিন্তু আমি প্রমাণ করে দিতে পারি।'

'বেশতো প্রমাণ করুন।'

'টেবিলের উপরে দেখ একটা বই আছে জীবনানন্দ দাসের কবিতাসমগ্র। বইটার নিচে একটা কাগজ আছে। কাগজটায় কি লেখা আছে পড়।'

চিত্রা কাগজটা নিয়ে পড়ল। কাগজে লেখা- "আমার সিক্সথ সেন্স বলছে চিত্রা ঠিক এগারোটায় আমার জন্যে চা নিয়ে আসবে। আমি চায়ের জন্য অপেক্ষা করছি।"

'পড়েছ?'

'হ্যাঁ'

'আজকের তারিখ দেয়া আছে দেখেছ?'

'হ্যাঁ'

'অবাক হয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'কতটুক অবাক হয়েছ?'

চিত্রা চাপা গলায় বলল, খুব অবাক হয়েছি।

'বিস্ময় অভিভূত?'

'হ্যাঁ।'

জোবেদ আলি চায়ে চুমুক দিতে দিতে হাসি মুখে বললেন, এত অল্পতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ো না। পরে সমস্যায় পরবে। সিক্সথ সেন্স টেন্স কিছু না। আমি যা করেছি তা হচ্ছে খুব সাধারণ একটা ট্রিকস। অনেকগুলি কাগজে একই জিনিস লিখেছি শুধু সময়টা একেক কাগজে একেক রকম। তুমি যদি বারটার সময় চা নিয়ে আসতে তাহলে

বলতাম জানালার কাছে যে পিরিচটা আছে সেই পিরিচের নিচের কাগজটা দেখ। সেই কাগজে লেখা চিত্রা ঠিক বারটার সময় আমার জন্যে চা নিয়ে আসবে। এখন বুঝতে পারছ?

'এটা কেন করলেন?'

'তোমার বিস্ময়ে অভিভূত করে দেবার জন্যে করলাম।'

'কৌশলটা পরে বলে ফেললেন- বিস্ময়টাতো আর রইল না।'

'কৌশলটা স্বীকার করায় বিস্ময় আরো দীর্ঘস্থায়ী হল। বিস্ময়ের সঙ্গে যুক্ত হল মজা। তাই না?'

'হঁা'

'গম্ভীর হয়ে আছ কেন?'

'রাগ লাগছে।'

'রাগ লাগছে কেন?'

'আপনার এত বুদ্ধি আর আমার এত কম বুদ্ধি এই জন্যে রাগ লাগছে।'

'তোমার বুদ্ধি কম কে বলল?'

'আমি জানি আমার বুদ্ধি কম। আমি মোটর সাইকেলের মত ফটফট করে কথা বলতে পারি কিন্তু আমার বুদ্ধি কম। আমি আমার বুদ্ধি দিয়ে কাউকে বোকা বানাতে পারি না। শুধু মাকে পারি।'

'উনাকে বোকা বানাও?'

'হ্যাঁ মা'র ধারণা আপনাকে আমার একেবারেই পছন্দ না।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। আমার বুদ্ধি কম হলেও আমি আবার ভাল অভিনয় জানি। আমি নানান ধরনের অভিনয় করে মা'কে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখি। মা'র ধারণা আমি আপনাকে দেখতে পারি না।'

'আসলে পার?'

চিত্রা কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। জোবেদ আলি টের পাচ্ছেন মেয়েটি রেগে যাচ্ছে। তিনি রাগ কমানোর চেষ্টা করলেন না। মাথা নীচু করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগলেন। চিত্রা বলল, আপনার বই লেখা কেমন এগুচ্ছে?

'ভাল।'

'এখন কি লিখছেন?'

'সৌন্দর্য কি? এই বিষয়ে একটা লেখা?'

'সৌন্দর্য কি?'

জোবেদ আলি হাসি মুখে বললেন, তাতো জানি না।

'যা জানেন না তার উপর লিখছেন কি ভাবে?'

'সৌন্দর্য কি তা যে আমি জানি না সেটাই লেখার চেষ্টা করছি।'

'আপনার কথা বুঝলাম না।'

'সব কথা যে বুঝতেই হবে এমন তো না। কথা না বোঝার মধ্যেও আনন্দ আছে।'

'আমি এখন চলে যাব।'

'আচ্ছা।'

'আমার মনটা খুব খারাপ আপনি আমার মন ভাল করে দিন।'

'মন কি ভাবে ভাল করব তাতো বুঝতে পারছি না। প্রবন্ধ যেটা লিখছি সেটা পড়ে শুনাব?'

'না।'

চিত্রা ওঠে দাড়াল। গম্ভীর মুখে বলল, আমি যাচ্ছি। জোবেদ আলি বললেন, এমন রাগী রাগী ভাব করে চলে যেও না তারপর দেখবে নিজেরই খারাপ লাগবে। খানিকক্ষণ বসে মনটা ভাল করে তারপর যাও।

'আমার মন ভাল হবে না।'

'মন ভাল হবার ব্যবস্থা করছি।'

'কি ব্যবস্থা?'

'তোমাকে একটা উপহার দিচ্ছি। উপহার পেলে মেয়েদের মন ভাল হয়।'

'খুব ভুল কথা বলেছেন। মেয়েদের এত ছোট করে দেখবেন না। মেয়েরা উপহারের কাঙ্গাল না।'

'আমি যে উপহার দেব তা পেয়ে তুমি অসম্ভব খুশি হবে তা আমি লিখে দিতে পারি।'

'উপহারটা কি?'

জোবেদ আমি উঠলেন। টেবিলের ড্রয়ার খুলে বেশ বড় সড় সাইজের একটা পাথর বের করে আনলেন। বিশেষত্বহীন পাথর। এইসব পাথর ভেঙ্গেই রেল লাইনে দেয়া হয়। দালান কোঠা তৈরীতে ব্যবহার হয়। এর বেশী কিছু না। চিত্রা আগ্রহী গলায় বলল, 'এই আপনার উপহার?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার ধারণা এই পাথর পেয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা হব?'

'হ্যাঁ হবে। কারণ এই পাথরে কিছু লেখা আছে।'

'কি লেখা?'

চিত্রা গভীর আগ্রহে পাথর হাতে নিল। কোন লেখা দেখতে পেল না। সারা পাথরের গায়ে বল পয়েন্টে অসংখ্যা গুণ চিহ্ন আঁকা।

'এই গুন চিহ্নের মানে কি?'

জোবেদ আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে হাসি মুখে বললেন, একটা গুণ চিহ্ন আঁকতে দু'টা দাগ দিতে হয়। দু'টা দাগ মানে দু'জন মানুষ। দু'টা দাগ দু'দিকে— তার মানে মানুষ দু'জন ভিন্ন প্রকৃতির। একটা জায়গায় দাগ দু'টি মিলেছে তার মানে হল দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ একটা জায়গায় মিলেছে। অর্থাৎ একটি ক্ষেত্রে তারা এক ও অভিন্ন। এরা দু'জন দু'জনকে পছন্দ করে।'

চিত্রা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। জোবেদ আলি বললেন, উপহার পছন্দ হয়েছে?

চিত্রা গাঢ় স্বরে বলল, হ্যাঁ।

জোবেদ আলি বললেন, তুমি বেশ কিছুদিন আগে আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলে আমি ভেবেছিলাম কোনদিন সেই চিঠির জবাব দেব না। আজ এই পাথর দিয়ে জবাব দিলাম।

চিত্রা ধরা গলায় বলল, থ্যাংক য়্যু। আমি খুব খুশী হয়েছি।

'বেশ তাহলে এখন যাও। আমি এখন "সৌন্দর্য বিষয়ে আমার অজ্ঞতা" প্রসঙ্গে লেখাটা শেষ করব।'

চিত্রা পাথর নিয়ে বের হয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পাথরটা সে গালে চেপে রাখল। তার চোখ পানিতে ভর্তি হয়ে আসছে।

২

'তোর কোলে এটা কি?'

চিত্রা মা'র দিকে না তাকিয়ে সহজ গলায় বলর, পাথর। এর ইংরেজী নাম Stone.

সুরমা বিস্মিত গলায় বললেন, পাথর কোলে নিয়ে বসে আছিস কেন?

চিত্রা এবার মা'র দিকে তাকাল। শান্ত গলায় বলল, বাংলাদেশ সংবিধানে এমন কোন ধারা আছে যে পাথর কোলে নিয়ে বসে থাকা যাবে না?

'সব কথায় তুই এমন প্যাঁচালো জবাব দিস কেন? সরাসরি জবাব দিতে অসুবিধা কি? রশীদ আমাকে বলল, তুই নাকি সারাক্ষণ একটা পাথর নিয়ে ঘুরিস। আমি তার কথা বিশ্বাসই করিনি। এখন দেখছি সত্যি।

পাথর নিয়ে ঘোরা কোন বড় অপরাধের মধ্যে পড়ে না মা। পাথর ছুঁড়ে কারো মাথার ঘিলু বের করে দিলে বাংলাদেশ পেনাল কোডের ৩০২ ধারায় মামলা হবে। পাথরতো আমি ছুঁড়ে মারছি না। কোলে নিয়ে বসে আছি।

'শুধু শুধু পাথর কোলে নিয়ে বসে আছিসই বা কেন?'

'আচ্ছা যাও আমি পাথর রেখে আসছি, অকারণে চেঁচিওনাতো মা।'

চিত্রা পাথর নিয়ে তার ঘরে ঢুকে পড়ল। সুরমা শংকিত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শংকিত হবার তাঁর যথেষ্ট কারণ আছে। পাথর নিয়ে চিত্রার বাড়াবাড়িটা আজ না অনেক আগেই তাঁর চোখে পড়েছে। তিনি কিছু বলেন নি। ব্যাপারটা কি বোঝার চেষ্টা করেছেন। সুরমা এই সংসারে বোকার একটা ভাব ধরে থাকেন। সংসার পরিচালনায় এতে তাঁর খুব লাভ হয়। বোকাদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে সবাই অসাবধানে থাকে। তাতে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।

চিত্রা যে জোবেদ আলি নামের আধবুড়ো মানুষটার জন্যে পাগল হয়ে আছে তা তিনি বুঝেছেন চিত্রার বোঝার আগেই। কিন্তু যেহেতু সংসারে তিনি বোকা সেজে থাকেন সেহেতু চিত্রাকে কিছু বুঝতে দেন নি। চিত্রা তাঁকে ভুলাবার জন্যে নানান ধরনের অভিনয় করছে। খুব কাঁচা অভিনয়। যখন তাকে বলা হয় যাতো জোবেদ সাহেবকে এক কাপ চা দিয়ে আয় কিংবা এই হালুয়াটা দিয়ে আয় সে বলবে— আমি পারব না মা। আমার উপরে যেতে ইচ্ছা করে না। তিনি যতই জুড়াজুড়ি করবেন সে ততই না করবে শেষে নিতান্ত অনিচ্ছায় উঠে যাবে। ফিরবে এক থেকে দু' ঘন্টা পর।

এইসব লক্ষণ খুবই খারাপ। অল্প বয়সের ভালবাসা অন্ধ গন্ডারের মত শুধুই একদিকে যায়। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, আদর দিয়ে এই গন্ডার সামলানো যায় না। সুরমা আতংকে অস্থির হয়ে আছেন। আতংকটা প্রকাশ করছেন না। পুরো ব্যাপারটা

বোঝার চেষ্টা করছেন। সমস্যাটা ভালমত বুঝতে পারলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যাবে। সমস্যাটা ভালমত বুঝতেও পারছেন না।

জোবেদ আলি সাহেবের ভূমিকাটা এখানে কি? ভদ্রলোক অতি বুদ্ধিমান। চিত্রার সমস্যাটা তাঁর বুঝতে না পারার কথা না। তিনি কি মেয়েটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন? না সমস্যাটা সামলাবার চেষ্টা করছেন? একজন দায়িত্বশীল বিচক্ষণ ভদ্রলোক এইসব ব্যাপার কখনো প্রশ্রয় দেবেন না। তাঁর বড় মেয়ের বয়স চিত্রার চেয়ে বেশী। প্রশ্রয় দিতে গেলে এই কথাটা তাঁর অবশ্যই মনে পড়বে। তবে ভদ্রলোকের নিজের মনেও যদি কোন রকম দুর্বলতা জমে থাকে তাহলে তিনিও অন্ধ গন্ডারের মত আচরণ করবেন। পাথরের যে দেবতা সেও পূজা গ্রহণ করে, মানুষ কেন করবে না?

এখন যা করতে হবে তা হল ভদ্রলোককে এ বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এই কাজটা তিনি করতে পারবেন না, চিত্রার বাবাকে দিয়ে করাতে হবে। তবে চিত্রার বাবাকে আসল কথা কিছুই বলা যাবে না। মেয়ের পাগলামী মানুষটার কানে গেলে ভয়ংকর কিছু ঘটে যেতে পারে। সুরমা তাঁর সংসারে ভয়ংকর কিছু চান না।

সুরমা রাতের খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে চিত্রার ঘরে গেলেন। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করবেন। গল্প করার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে জোবেদ আলি সম্পর্কে কিছু কথা বলে দেখবেন মেয়ের মুখের ভাব বদলায় কিনা। দরকার হলে আজ রাতে মেয়ের ঘরে ঘুমুবেন।

চিত্রা মশারী খাটিয়ে শুয়ে পরার আয়োজন করছিল। চিত্রা মা'কে দেখে বলল, কি হয়েছে মা?

সুরমা হাই তুলতে তুলতে বললেন, আজ তোর সঙ্গে ঘুমুবরে মা।

'আমার সঙ্গে ঘুমুবে কেন?'

'তোর বাবার সঙ্গে ঝগড়ার মত হয়েছে। এই জন্যে।'

'অসম্ভব। মা তুমি আমার সঙ্গে ঘুমুতে পারবে না। তোমার গা থেকে মশলার গন্ধ আসে।'

'কি বলিস তুই, গা থেকে মশলার গন্ধ আসবে কেন?'

'সারাদিন রান্নাবান্না নিয়ে থাক মশলার গন্ধতো আসবেই—এখন আসছে হলুদ আর পেয়াজের গন্ধ। তাছাড়া মা তিনজনের এক বিছানায় জায়গাও হবে না। বিছানা ছোট।'

সুরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, তিনজন কোথায়?

'আমি, তুমি আর পাথর। পাথরটা রাতে আমার সাথে ঘুমায়।'

'পাথর রাতে তোর সঙ্গে ঘুমায়?'

'হ্যাঁ।'

'আমারতো মনে হয় তুই পাগল টাগল হয়ে যাচ্ছিস।'

'পাগল হব কেন? পাথর সঙ্গে নিয়ে ঘুমালেই মানুষ পাগল হয়ে যায় না। তুমি কি পুতুল সঙ্গে নিয়ে ছোটবেলায় ঘুমুতে না? পাথরটা হচ্ছে আমার পুতুল।'

'পাথরটাকে তুই গোসল দিস? রশীদ আমাকে বলছিল।'

'রশীদতো দেখি বিরাট বড় স্পাই হয়েছে। কি করি না করি সব রিপোর্ট করছে।'

'পাথরটাকে তুই গোসল দিস কি-না সেটা বল।'

'হুঁ দেই।'

'কেন?'

'এম্নি দেই মা। এটা একটা খেলা। মজার খেলা। আমারতো খেলার কেউ নেই কাজেই পাথর নিয়ে খেলা। তুমিতো আর আমার সঙ্গে খেলবে না।'

সুরমা মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চিত্রার মশারি খাটানো শেষ হয়েছে। সে তার পড়ার টেবিল থেকে পাথরটা নিয়ে বালিশে শুইয়ে দিয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে হালকা গলায় বলল, এসো ঘুমুতে এসো মা। রাত প্রায় বারোটা বাজে।

'তুই সত্যি সত্যি পাথর নিয়ে ঘুমুবি?'

'হুঁ।'

'পাথরটা তোকে কে দিয়েছে জোবেদ সাহেব?'

'ইয়েস মাদার।'

'তিনি তোকে খুব স্নেহ করেন?'

'স্নেহ করেন না হাতী। স্নেহ করলে কেউ কাউকে পাথর দেয়? দামী গিফট টিফট দিতে পারে।' আড়ং এর সেলোয়ার বা পাথর বসানো নেকলেস।'

'পাথরটা দিলেন কেন?'

'উফ মা চুপ করতো। তোমার বকবকানীর কারণে পাথর বেচারা ঘুমুতে পারছে না। ও ডিসটারবেন্স একেবারে সহ্য করতে পারে না। এই শেষবারের মত আমি তোমাকে আমার ঘরে ঘুমুতে দিলাম। আর না।'

চিত্রা ঘুমিয়ে পড়েছে। তার একটা হাত পাথরের উপর রাখা। সুরমা গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন ঘুমের মধ্যেই চিত্রা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চোখের জলে বালিশ ভিজে যাচ্ছে। পাথরটা টেনে বুকের কাছে নিয়ে নিল। একি সর্বনাশ! সুরমা সারা রাত জেগে রইলেন।

৩

জোবেদ আলি বললেন, তোমার কি খবর?

চিত্রা হাসিমুখে বলল, আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি।

'খুব ভাল কথা বিরক্ত কর।'

'জ্ঞানের কিছু কথা জানিয়ে দিনতো।'

'জ্ঞানের কথা জানতে চাও?'

'হুঁ চাই। জ্ঞানের কথা বলতে বলতে আপনি যখন ক্লান্ত হয়ে যাবেন তখন কিছুক্ষণ ভালবাসার কথা বলতে পারেন।'

'ভালবাসার কথাও শুনতে চাও?'

'হুঁ চাই। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে খুব অসভ্য মেয়ে ভাবছেন। ভাবলে ভাববেন। আমি কেয়ার করি না।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ তাই। এখন থেকে আমি ঠিক করেছি যখনই আমার জ্ঞানের কথা শুনতে ইচ্ছা করবে তখনি আমি চলে আসব। সেটা সকাল হতে পারে, দুপুর হতে পারে আবার রাত তিনটাও হতে পারে। কাজেই কখনো যদি রাত তিনটায় আপনার দরজায় টুক টুক শব্দ হয় তাহলে ভূতটুত ভেবে বসবেন না। এখন বলুন আপনার জ্ঞানের কথা।'

'জ্ঞানের কথা শুনবে?'

'হুঁ।'

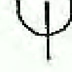
'ফেরাউনদের সময়কার হিরেলোগ্রাফি দিয়ে একটা গল্প বলব?'

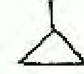
'বলুন।'

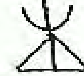
'কাগজ কলম দাও গল্প বলি।'

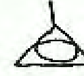
'গল্প বলতে কাগজ কলম লাগে?'

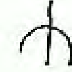
'এই গল্পে লাগে। গল্পটা হচ্ছে আদি ও মৌলিক গল্প। গল্পের মজাটা হল চিত্র লিপিতে, গল্প শোনার সঙ্গে সঙ্গে কি ছবি আঁকা হচ্ছে তা খেয়াল রাখবে—

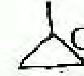
এক দেশে এক রাজা ছিল 

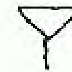
রাজার এক রাণী ছিল 

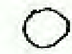
রাজা ও রানী সুখে বাস করত 

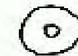
এক সময় রাণী গর্ভবতী হলেন 

তখন হঠাৎ রাজা মারা গেলেন 

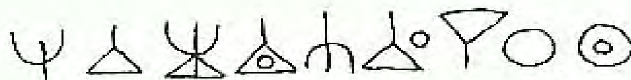
যথাসময়ে রাণীর এক সন্তান হল 

এক সময় রাণীও মারা গেলেন 

বেঁচে রইল শুধু রাজ কুমার। 

এবং রাজকুমারের মধ্যে রাজবংশের ভবিষ্যৎ বীজ। 

চিত্রকথায় পুরো গল্পটা হবে—



গল্পটা কেমন লাগল?

চিত্রা ক্ষীণ গলায় বলল, অদ্ভুত। জোবেদ আলি বললেন, ছবি এঁকে এঁকে বান্ধবীদের সঙ্গে এই গল্পটা করবে দেখবে ওরা খুব মজা পাবে।

চিত্রা গম্ভীর মুখে বলল, আমার কোন বান্ধবী নেই। বান্ধবী থাকলে অবশ্যই এই গল্পটা বলতাম। আচ্ছা আপনি কি হাত দেখতে পারেন?

'না।'

'আমার মনে হচ্ছে পারেন। প্লীজ আমার হাত দেখে দিন।'

'এস্ট্রলজির দু'একটা বই টই পড়েছি— কিন্তু হাত দেখার উপর কোন বই পড়ি নি।'

চিত্রা বলল, আমি হাত দেখার উপর কোন বই পড়ি নি— কিন্তু আমি হাত দেখতে জানি। একজনের কাছ থেকে শিখেছি— দেখি আপনার হাতটা দিন-আমি দেখে দেই।

'এই বয়সে তুমি আমার হাতে কিছু পাবে না। মৃত্যু রেখা পেতে পার। মৃত্যু রেখার ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই।'

'আপনার না থাকলেও আমার আছে।'

জোবেদ আলি গম্ভীর গলায় বললেন— হাত দেখা টেখা কিছু না, তুমি আসলে আমার হাত ধরার একটা অজুহাত খুঁজছ।

'আপনার তো বেশী বুদ্ধি এইজন্যে সব আগে ভাগে বুঝে ফেলেন। আপনার হাত ধরতে চাইলে আমি সরাসরিই হাত ধরতাম, ভনিতা করতাম না।'

'হাত ধরতে চাও না?'

চিত্রা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে গাঢ় গলায় বলল, চাই।

জোবেদ আলি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

সুরমা ছাদে এসেছিলেন শুকনা কাপড় নিতে। শুকনা কাপড় নেয়াটা তাঁর অজুহাত তিনি আসলে এসেছেন চিত্রা কি করছে তা দেখার জন্যে। কাপড় তুলতে তুলতে নিঃশব্দে দেখে চলে যাবেন এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। তিনি খোলা জানালায় যে দৃশ্য দেখলেন তা দেখার জন্যে তাঁর কোন মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। তিনি দেখলেন চিত্রা দু'হাতে জোবেদ আলির হাত চেপে ধরে আছে এবং ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। জোবেদ আলি মূর্তির ভঙ্গিমায় বসে আছেন।

সুরমা সম্বিৎ ফিরে পেয়েই দ্রুত নিচে নেমে গেলেন। সারা বিকাল তাঁর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। সন্ধ্যায় প্রচণ্ড মাথা ধরল। রাতে তিনি কিছু খেতে পারলেন না। আজীজ সাহেব রাতের খাওয়া শেষ করে ঘুমুতে এলে সুরমা বললেন— জোবেদ সাহেবতো অনেকদিন থাকলেন এখন চলে যেতে বললে কেমন হয়?

আজীজ সাহেব চোখ সরু করে তাকালেন। স্ত্রীর সব কথাতেই তিনি চোখ সরু করেন। এবার যেন আরো বেশী সরু করলেন।

'বোকার মত কথা বলবে না। একজন ভদ্রলোককে খামাখা চলে যেতে বলব কেন? অসুবিধাটা কি? মাসে মাসে দু' হাজার টাকা পাচ্ছ। এটা সহ্য হচ্ছে না? তুমি হাড়ি পাতিল নিয়ে আছ হাঁড়ি পাতিল নিয়ে থাক।'

সুরমা তারপরেও ক্ষীণ গলায় বললেন, একজন পুরুষ মানুষ ছাদে থাকে— মেয়েরা ছাদে কাপড় শুকুতে যায়।

'তাতে হয়েছে কি?'

'না কিছু হয় নি।'

'কাকে ভাড়া দেব কাকে দেব না এইসব চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। চিন্তার মানুষ আছে।'

'আচ্ছা।'

'বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে আস।'

সুরমা বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে গেলেন ঠিকই তাঁর এক ফোটা ঘুম হল না। এক রাতে চারবার চিত্রার শোবার ঘরে গেলেন দেখার জন্যে চিত্রা ঘরে আছে কি—না। তাঁর মনে হল বাকি জীবনে তিনি আর কখনোই রাতে ঘুমুতে পারবেন না।

চিত্রার ঘরের বাতিও জ্বলছে। বাতি জ্বেলে সে কি করছে? দরজায় টুকা দিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবেন? চিত্রা রেগে যাবেনাতো? সে আজকাল অল্পতেই রেগে আগুন হচ্ছে। অকারণেই রাগছে। তিনি মেয়ের ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। টোকার শব্দ শুনেই চিত্রা বলল, কি চাও মা?

'ঘুমাচ্ছিস না?"

'না।'

'না কেন?'

'ওর ঘুম ভেঙ্গে গেছে কাজেই আমিও জেগে আছি। গল্প করছি।'

'কার সঙ্গে গল্প করছিস?'

'পাথরটার সঙ্গে।'

'মা দরজাটা একটু খুলতো।'

সুরমা ভেবেছিলেন মেয়ে দরজা খুলবে না। রাগ করবে। সে রকম হল না। চিত্রা দরজা খুলল। তার এক হাতে পাথর। মেয়ে কি সারাক্ষণই পাথর হাতে বসে থাকে। সুরমা ক্ষীণ স্বরে বললেন, তুই পাথরের সঙ্গে গল্প করছিলি?

'হুঁ।'

'পাথর কথা বলতে পারে?'

'পাথর কি কথা বলবে? পাথর কি মানুষ না-কি? আমি কথা বলি ও শুনে।'

'তুই ঘুমুতে যাস কখন?'

'আমি ঘুমুতে যাই না। রাতে আমার ঘুম হয় না মা। আগে ঘুমের অষুধ খেলে ঘুম হত এখন তাও হয় না। আজ পাঁচটা ঘুমের অষুধ খেয়ে শুয়েছিলাম। ঠিক এক ঘন্টা পর জেগে উঠেছি।'

'তুই একজন ভাল ডাক্তার দেখা।'

'শুধু শুধু ডাক্তার দেখাব কেন? আমার জ্বর হয়নি। মাথা ব্যথা হচ্ছে না। দিব্যি আরামে আছি। মা তুমি এখন যাওতা র সঙ্গে আমার খুব গোপন কিছু কথা আছে। তোমার সামনে বলা যাবে না।'

'তুই শুয়ে থাক আমি তোর চুলে বিলি দিয়ে দি।'

'তুমি আমাকে অনেক বিরক্ত করেছ। এখন যাও আর না।'

তিনি বের হয়েএসে জায়নামাজে বসলেন। ফজর ওয়াক্ত পর্যন্ত দোরুদ পাঠ করলেন। দুরুদে শেফা।

ফজরের নামাজ শেষ করেই তিনি খতমে ইউনুস শুরু করলেন। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার পড়তে হবে দোয়া ইউনুস। ইউনুস নবী এই দোয়া পড়ে মাছের পেট থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। সুরমা যে বিপদে পড়েছেন— মাছের পেটে বাস করা তার কাছে কিছুই না। কিছু কিছু বিপদ থাকে মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম—চোখে পর্যন্ত দেখা যায় না, কিন্তু মাকড়শার জালের মত হালকা না। এই ধরনের বিপদ আপদ থেকে সচরাচার উদ্ধার পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের অসীম দয়াতেই উদ্ধার সম্ভব। তিনিতো কোন পাপ করেন নি। আল্লাহ পাক কি তাকে দয়া করবেন না?

আল্লাহ পাক সুরমাকে দয়া করলেন— এক রোববার ভোরে আজীজ সাহেবের বাড়ির উঠান লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। উঠানে জোবেদ আলি হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন— তাঁর মাথা থ্যাতলানো। ঘিলু বের হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। ভয়াবহ দৃশ্য। মানুষটা খুব ভোরবেলা তিনতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে গেছে।

আজীজ সাহেব মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর লাভের গুড় পিপড়া খেয়ে ফেলল। ঘটনা সামলাবার জন্যে পুলিশকে ষাট হাজার টাকা ঘুস দিতে হয়েছে। পুলিশ ইচ্ছা করলে কৃষ্ণপক্ষের রাতকে চৈত্রমাসের দিন করে ফেলতে পারে। সামান্য আত্মহত্যাকে মার্ডার বলতে তাদের আটকাবে না। সম্পূর্ণ বিনাকারণে তাকে জেল হাজতে পঁচতে হবে।

পুলিশের সমস্যা সামাল দিলেও আজীজ সাহেব ঘরের সমস্যা সামাল দিতে পারলেন না। চিত্রার মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেল। তার কথা অস্পষ্ট হয়ে গেল। কাকে কি বলে না বলে কিছু বোঝা যায় না। তার খাওয়ার ঠিক নেই, নাওয়ার ঠিক নেই। সারাদিন তার কোলে থাকে পাথর। সে নিজে গোসল করে না, পাথরটাকে রোজ গোসল দেয়। গুণগুণ করে পাথরকে কি যেন বলে।

আজীজ সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, এর কি হয়েছে? এ রকম করে কেন?

সুরমা বললেন, কিছু না। ঠিক হয়ে যাবে। এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে মাথাতো খানিকটা এলোমেলো হবেই।

'কারো মাথা এলোমেলো হল না, তারটা হল কেন?'

'বাচ্চা মানুষ। ঠিক হয়ে যাবে।'

'পাথর নিয়ে এইসব কি করছে?'

'বললামতো ঠিক হয়ে যাবে কয়েকটা দিন যাক।'

'ব্যাপারটা কি ঠিকমত গুছিয়ে বলতো।'

'ব্যাপার কিছু না, জোবেদ ভাই চিত্রাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সারাক্ষণ 'মা' মা ডাকতেন। চিত্রা দেখতেও তাঁর মেয়ের মত। নিজের মেয়েকে দেখেন না সেই জন্যে .... ।

'তিনি চিত্রাকে স্নেহ করতেন বলে চিত্রাকে একটা পাথর গালে লাগিয়ে বসে থাকতে হবে? আমিতো কিছু বুঝছি না— ঐ হারামজাদার সঙ্গে আমার মেয়ের কি হয়েছে?'

'তুমি মাথা গরম করো না। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ডাক্তারের কাছে নিয়ে চিকিৎসাতো করানো দরকার।'

'চিকিৎসা করাব, কয়েকটা দিন যাক।'

চিত্রার অসুখ সারতে দীর্ঘদিন লাগল।

এক সকালে সে তার স্যুটকেসে পাথর ভরে রেখে সহজ গলায় মা'কে বলল, মা নাশতা দাও ক্ষিধে লেগেছে।

সুরমা মনের আনন্দে কেঁদে ফেললেন। তার দু'বছর পর চিত্রার বিয়ে হয়ে গেল এক ডাক্তার ছেলের সঙ্গে। শ্যামলা হলেও ছেলেটি সুপুরুষ। খুব হাসি খুশি, সারাক্ষণ মজা করছে। চিত্রার তার স্বামীকে খুব পছন্দ হল। পছন্দ হবার মতই ছেলে। চিত্রা মণিপুরী পাড়ায় তার স্বামীর ?পৈত্রিক বাড়িতে বাস করতে গেল। তার জীবন শুভ খাদে বইতে শুরু করল।

তের বছর পরের কথা।

চিত্রা তার মেয়েকে নিয়ে কিছুদিন বাবার বাড়িতে থাকতে এসেছে। চিত্রার স্বামী গিয়েছে ভিয়েনায় ডাক্তারদের কি একটা সম্মেলনে। চিত্রারও যাবার কথা ছিল, টিকিট ভিসা সব হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা ফ্লাইট, ভোরবেলা ছোট একটা দুর্ঘটনা ঘটল। চিত্রার মেয়ে রুনি সিঁড়ি থেকে পা পিছলে পড়ে সামনের একটা দাঁত ভেঙ্গে ফেলল। এমন কোন বড় দুর্ঘটনা না। কিছু রক্ত পড়েছে, ঠোঁট কাটার জন্যে ফুলে গেছে। এতেই চিত্রা অস্থির হয়ে গেল। সে কিছুতেই মেয়েকে ফেলে যাবে না। সে থেকে যাবে। রুনি যতবারই বলে, তুমি যাওতো মা ঘুরে আস। তুমি না গেলে বাবা মনে খুব কষ্ট পাবে। ততবারই চিত্রা বলে, তুই মাতাব্বরী করবি নাতো। তোর মাতাব্বরি অসহ্য লাগে।

'বাবা এত আগ্রহ করে তোমাকে নিতে চাচ্ছে তাঁর কত রকম প্লান।'

'যথেষ্ট বক বক করেছিস। আর না। তোকে ফেলে রেখে আমি যাব না। এটা আমার ফাইন্যাল কথা।'

মা'র বাড়িতে এসে চিত্রার খুব ভাল লাগছে। তার কাছে মনে হচ্ছে পৃথিবীর কিছু কিছু জিনিস বদলায় না। সেই কিছু কিছু জিনিসের একটি হচ্ছে মা'র বাড়ি। মা বদলে গেছেন। একটা চোখে কিছুই দেখেন না। হাত কাঁপা রোগ হয়েছে—পারকিনসনস ডিজিজ। সারাক্ষণই হাত কাঁপে। কিন্তু মনের দিক থেকে আগের মতই আছেন। খানিকটা পরিবর্তন অবশ্যি হয়েছে— আগে বোকার ভাব ধরে থাকতেন এখন থাকেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর বোকা ভাব ধরে থাকার প্রয়োজন সম্ভবত ফুরিয়েছে। ভাড়াটে, স্বামীর ব্যবসা, দোকান সব তিনি নিজে চালান এবং ভালই চালান। আজীজ সাহেব তার বোকা স্ত্রীর কর্মক্ষমতা দেখে যেতে পারেন নি। দেখে গেলে বিস্মিত হতেন।

চিত্রা বেশীর ভাগ সময় তার মায়ের সঙ্গে গল্প করে কাটায়। তার সব গল্পই স্বামী এবং কন্যাকে কেন্দ্র করে।

'রুনির খুব বুদ্ধি হয়েছে মা। ওর বুদ্ধি দেখে মাঝে মাঝে ভয় লাগে।'

'বুদ্ধিতো ভাল জিনিস। বুদ্ধি দেখলে ভয় লাগবে কেন?'

'অতিরিক্ত বুদ্ধির মানুষ অসুখী হয় এই জন্যেই ভয়। যার মোটামুটি বুদ্ধি সে থাকে সুখে। এই যে আমাকে দেখ আমি সুখে আছি।'

'সুখে আছিস?'

'খুব সুখে আছি।'

'স্বামীর ভালবাসা পুরোপুরি পেয়েছিস?'

'হুঁ। ও আমাকে জিজ্ঞেস না করে কিচ্ছু করে না। একদিন কি হয়েছে মা শোন ওর স্কুল জীবনের এক বন্ধুর ছেলের জন্মদিনে গিয়েছে। আমারো যাবার কথা— ভাইরাস জ্বরে ধরেছে বলে যাইনি। ও একা গিয়েছে। রাত আটটায় তার টেলিফোন। টেলিফোনে বলল, রুনি আমার বন্ধু খুব ধরেছে বাসায় খেয়ে আসতে। খেয়ে আসব? আমি বললাম, একি রকম কথা? বন্ধু খেতে বলেছে খেয়ে আসবে এর মধ্যে জিজ্ঞেস করা করির কি আছে। অবশ্যিই খেয়ে আসবে। টেলিফোনটা যে করেছে তারো ইতিহাস আছে। বন্ধুর বাসায় টেলিফোন নেই, কার্ডফোন থেকে করেছে।

সুরমা হাসি মুখে বললেন, গৃহপালিত স্বামী।

চিত্রা আনন্দিত গলায় বলল, আমার গৃহপালিত স্বামীই ভাল।

'পোষ মানাতে পারলে সব স্বামীই গৃহপালিত হয়। তুই পোষ মানানোর কায়দা জানিস। আমি জানতাম না।'

'তুমিও জানতে। তুমি সেই কায়দা ব্যবহার করনি। বোকা টাইপের স্ত্রীরা স্বামীকে গৃহপালিত করে ফেলতে চায়— যাদের খুব বেশি বুদ্ধি তারা চায় না। ঠিক বলিনি মা?'

'মনে হয় ঠিকই বলেছিস।'

'ও দশদিনের জন্যে ভিয়েনা গিয়েছে। কিন্তু মা আমি নিশ্চিত ও চারদিনের মাথায় ফিরে আসবে। এই নিয়ে আমি এক লক্ষ টাকা বাজি ধরতে পারি। বাজি ধরবে?'

'পাগল হয়েছিস বাজি ধরলেই আমি হারব।'

মনের আনন্দে চিত্রা হাসতে লাগল। সেই হাসি দেখে সুরমার মন ভরে গেল। তিনিও অনেকদিন পর মন খুলে হাসলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর এমন আনন্দময় সময় তাঁর জীবনে আসেনি।

রাতে শোবার সময় রুনি রহস্যময় গলায় বলল, মা দেখ কি পেয়েছি। এই তাকাও একটু।

'কি পেয়েছিস?'

'একটা পাথর। এই দেখ মা— পাথরটার গাটা কি মসৃণ।'

চিত্রা তাকাল। তার শরীর মনে হল জমে গেছে। শরীরের ভেতরটা জমে গেলেও হাত পা কাঁপছে। রুনি বিস্মিত হয়ে বলল, তোমার কি হয়েছে মা?

চিত্রা জড়ানো গলায় বলল, পাথর কোথায় পেয়েছিস?

'খাটের নিচে। তুমি এ রকম করছ কেন?'

চিত্রার মাথা যেন কেমন করছে। সে এসে খাটে বসল।

রুনি বলল, পানি খাবে মা? পানি এনে দেব?

'হুঁ।'

রুনি পানির গ্লাস হাতে এনে দেখে তার মা পাথর কোলে নিয়ে বসে আছে। মা'র কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখ রক্তশূন্য। যেন অনেকদিন কঠিন রোগ ভোগ করে উঠেছে।

'মা পানি নাও।'

চিত্রা আগের মতই জড়ানো গলায় বলল, পানিটা খাইয়ে দাও মা। কথা অস্পষ্ট শুনাল আবার তার পুরানো অসুখটা কি ফিরে আসছে?

'পাথরটা কোলে নিয়ে বসে আছ কেন মা?'

'ছোটবেলায় আমি এই পাথর নিয়ে খেলতাম।'

'এতবড় পাথর নিয়ে কি খেলতে?'

'পাথরটাকে গোসল করাতাম। আদর করতাম। ঘুমুবার সময় সঙ্গে নিয়ে ঘুমাতাম। চুমু খেতাম।'

'কেন?'

'তখন আমার একটা অসুখ হয়েছিল।'

'অসুখটা কি এখনো আছে?'

'না।'

'ঘুমুবে না মা?'

'হ্যাঁ ঘুমাব।'

চিত্রা পাথর সঙ্গে নিয়ে ঘুমুতে গেল। রুনি দেখল কিন্তু কিছুই বলল না। মা'কে তার এখন খুবই অচেনা লাগছে। মনে হচ্ছে মা অপরিচিত একটা মেয়ে যাকে সে চিনতে পারছে না, মাও তাকে চিনছে না। রুনি ভয়ে ভয়ে ডাকল, মা মা।

চিত্রা মেয়ের দিক থেকে মুখ সরিয়ে অন্য পাশে ফিরল। তার হাতে পাথরটা ধরা। রুনি আবার ডাকল, মা মা, একটু এদিকে ফের।

চিত্রা ফিরল না বা জবাবও দিল না। রাত বাড়তে লাগল। পুরো বাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেও চিত্রা ঘুমুতে পারছে না। ঘুম না হবার জন্যে তার কষ্টও হচ্ছে না। ঘর অন্ধকার। পাশেই তার মেয়ে ঘুমুচ্ছে। মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে। বারান্দার বাতির খানিকটা আলো এসে পড়েছে বিছানায়। চিত্রা ঘুমুচ্ছে তার পরিচিত খাটে। এই ঘরের প্রতিটি জিনিস তার চেনা— তারপরও সব কেমন অচেনা হয়ে গেছে। মাথা কেমন ঝিম ঝিম করছে। মনে হচ্ছে সে একগাদা ঘুমের অষুধ খেয়েছে।

'চিত্রা।'

চিত্রা বলল, হুঁ।

'তুমি কেমন আছ?'

'ভাল।'

'পাশে যে ঘুমুচ্ছে সে কি তোমার মেয়ে?'

'হুঁ।'

কেউ একজন তাকে প্রশ্ন করছে। সেই কেউটা কে? পাথরটা কি প্রশ্ন করছে? হ্যাঁ তাইতো পাথরটাতো কথা বলছে। চিত্রা বিস্মিত হল না। পাথরটা তার সঙ্গে কথা বলছে এটা তার কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। সে জবাব দিচ্ছে এটাও স্বাভাবিক। কেন সে জবাব দেবে না?

'চিত্রা!'

'হুঁ।'

'তোমার সুন্দর সংসার হয়েছে এটা দেখেও আমার ভাল লাগছে।'

'হুঁ।'
'আমি জানতাম তোমার সুন্দর সংসার হবে।'
'আপনি মরে গেলেন কেন?'
'মৃত্যু খুব স্বাভাবিক ব্যাপার নয় কি?'
'এভাবে মরলেন কেন?'
'যে ভাবেই মরি, মৃত্যু হচ্ছে মৃত্যু।'
'জ্ঞানের কথা ভাল লাগছে না!'
'পৃথিবীর সব কথাই জ্ঞানের কথা।'
'আপনি মরে গেলেন কেন?'
'কেউ একজন ভেবেছিল আমার মৃত্যুতে তোমার সমস্যা সমাধান হবে। হয়েছেও তাই। তোমার এখন আর কোন সমস্যা নেই।'
'আপনাকে কি কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল?'
'হুঁ।'
'আমার তাই মনে হয়েছে। আপনার ডেড বডি উঠোনে পড়েছিল— আমি দেখতে যাই নি।'
'ভাল করেছ। দৃশ্যটা অসুন্দর। অসুন্দর কিছু না দেখাই ভাল।'
'কে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল?'
'যেই ফেলুক। তার উপর আমার কোন রাগ নেই?'
'আমারো নেই। তারপরেও জানতে ইচ্ছে করে কে। আমি যখন অসুস্থ ছিলাম তখন সব সময় মনে হত আমি আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছি। আচ্ছা বলুতো আমি কি ফেলেছি?'
'না— তোমার মা ফেলেছিলেন।'
'ও আচ্ছা।'
'তোমার মা'র উপর আমার কোন রাগ নেই চিত্রা।'
'আমিতো আপনাকে আগেই বলেছি আমারো রাগ নেই।'
'তোমার মেয়েটি খুব সুন্দর হয়েছে ওর নাম কি?'
'ওর নাম রেনু— ভাল নাম রেহনুমা।'
'সুন্দর নাম।'
'ওর খুব বুদ্ধি।'
'শুনে ভাল লাগছে চিত্রা।'
'কতদিন পর কথা বলছেন আমার অসম্ভব ভাল লাগছে।'
'তোমার ভাল লাগছে শুনে আমারো ভাল লাগছে। আমি সারারাত কথা বলব— তোমাকে কিন্তু তারপর ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে।'
'আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। আপনি যদি আমাকে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে বলেন আমি লাফিয়ে পড়ব। আপনি বলে দেখুন।'
'তোমাকে এইসব কিচ্ছু করতে হবে না।'
'কি করতে হবে বলুন।'

'ভোরবেলা তুমি ছাদে উঠবে, পারবে না?'

'পারব।'

'হাতে থাকবে পাথরটা।'

'আচ্ছা।'

'তারপর পাথরটা ছুড়ে ফেলবে ঠিক আমি যে জায়গায় পড়েছিলাম সেই জায়গায়।'

'কেন?'

'আমি পাথরের ভেতর বন্দি হয়ে আছি। পাথরটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেলেই আমি মুক্তি পাব।'

'আমার এখন জ্ঞানের কথা শুনতে ইচ্ছে করছে, আপনি জ্ঞানের কথা বলুন।'

'I often see flowers from a passing car
That are gone before I can tell what they are.

'এর মানে কি?'

'রবার্ট ফ্রস্টের একটা বিখ্যাত কবিতার প্রথম দু'টি লাইন।'

'জ্ঞানের কথা শুনতে ভাল লাগছে না, অন্য কিছু বলুন ...... ভালবাসার কথা বলুন! আচ্ছা ভালবাসা কি?

রাত শেষ হয়ে আসছে। আকাশে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। চিত্রা পাথর হাতে খুব সাবধানে খাট থেকে নামল।

সুরমা ফজরের নামাজে বসেছিলেন। বিকট শব্দে তিনি নামাজ রেখে উঠে দাঁড়ালেন। ভারী কিছু যেন ছাদ থেকে পড়ল?

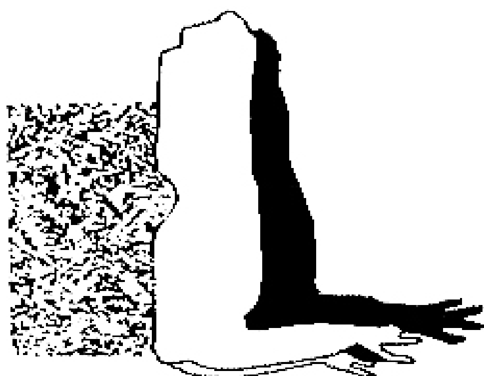
কে পড়ল? তাঁর বুক ধ্বক ধ্বক করছে। সেই ধ্বক ধ্বকানি তীব্র হবার আগেই চিত্রা ঢুকল। সুরমা স্বাভাবিক হলেন। সহজ গলায় বললেন, কিসের শব্দ?

চিত্রা খুব সহজ গলায় বলল— আমার যে একটা পাথর ছিল সেই পাথরটা টুকরা টুকরা করে ভাঙলাম। ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলেছি— একেবারে শত খণ্ড হয়েছে।

সুরমা তাকিয়ে রইলেন।

চিত্রা বলল, চা খাবে মা? চা বানিয়ে নিয়ে আসি তারপর এসো দু'জনে মিলে চুকচুক করে চা খাই। ও আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি— তুমি জোবেদ চাচাকে ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলে তাই না মা?

সুরমা তাকিয়েই রইলেন কোন জবাব দিলেন না। চিত্রা হালকা গলায় বলল, ভালই করেছ মা। তোমার চায়ে চিনি দেব? তুমি চায়ে চিনি খাওতো?



পিপড়া

আপনার অসুখটা কী বলুন?

রোগী কিছু বলল না, পাশে বসে— থাকা সঙ্গীর দিকে তাকাল।

ডাক্তার নূরুল আফসার, এমআরসিপি, ডিপিএস, অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তাঁর বিরক্তির তিনটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে, আটটা বেজে গেছে— রোগী দেখা বন্ধ করে বাসায় যেতে হবে। আজ তাঁর শ্যালিকার জন্মদিন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, গ্রাম থেকে আসা রোগী তিনি পছন্দ করেন না— এরা হয় বেশি কথা বলে, নয় একেবারেই কথা বলে না। ভিজিটের সময় হলে— দরদাম করার চেষ্টা করে। হাত কচলে মুখে তেলতেলে ভাব ফুটিয়ে বলে, কিছু কম করা যায় না ডাক্তার সাব? গরীব মানুষ!

আজকের এই রোগীকে অপছন্দ করার তৃতীয় কারণটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবু নূরুল আফসার সাহেবের কাছে এই কারণটিই প্রধান বলে বোধ হচ্ছে। লোকটির চেহারা নির্বোধের মত। এই ধরনের লোক নিজের অসুখটাও ঠিকমত বলতে পারে না। অন্য একজনের সাহায্য লাগে।

বলুন, তাড়াতাড়ি বলুন। আমার অন্য কাজ আছে।

লোকটি কিছু বলল না। গলা খাঁকারি দিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল। ভাবখানা এরকম যে অসুখের কথাবার্তা সঙ্গীটিই বলবে। সে— ও কিছু বলছে না। ডাক্তার নূরুল আফসার হাতঘড়ির দিকে একঝলক তাকিয়ে বললেন, গরু-ছাগল তার কী অসুখ বলতে পারে না। তাদের অসুখ অনুমানে ধরতে হয়। আপনি তো আর গরু—ছাগল না। চুপ করে আছেন কেন? আপনার নাম কি?

রোগী কিছু বলল না। তার সঙ্গী বলল, উনার নাম মকবুল। মোহাম্মদ মকবুল হোসেন ভূঁইয়া।

নামটাও অন্য আরেকজনকে বলে দিতে হচ্ছে। আপনি কি কথা বলতে পারেন না— পারেন না?

পারি।

কী নাম আপনার?

মোহাম্মদ মকবুল হোসেন ভূঁইয়া।

বয়স কত?

বায়ান্ন।

আপনার সমস্যাটা কি?

রোগী মাথা নিচু করে ফেলল। নূরুল আফসার সাহেবের ধারণা হল অস্বস্তিকর কোন অসুখ, যার বিবরণ সরাসরি দেয়া মুশকিল।

আর তো সময় দিতে পারব না। আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। যদি কিছু বলার থাকে এক্ষুণি বলবেন। বলার না থাকলে চলে যান।

রোগী আবার গলা খাঁকারি দিল।

তার সঙ্গী বলল, উনার অসুখ কিছু নাই।

অসুখ কিছু নেই, তা এসেছেন কেন?

উনারে পিঁপড়ায় কামড়ায়।

কী বললেন?

পিঁপড়ায় কামড়ায়। পিপিলিকা।

ডাক্তারি করতে গেলে অধৈর্য হওয়া চলে না। রোগীদের সঙ্গে রাগারাগিও করা চলে না। এতে পশার কমে যায়। রোগের বিবরণ শুনে বিস্মিত হওয়াও পুরোপুরি নিষিদ্ধ। রোগের ধরণ—ধারন যতই অদ্ভুত হোক ভান করতে হয় যে, এ জাতীয় রোগের কথা তিনি শুনেছেন এবং চিকিৎসা করে আরাম করেছেন। নূরুল আফসার সাহেব ডাক্তারির এই সব সহজ নিয়ম—কানুন নিষ্ঠার সঙ্গে মানেন। আজ মানতে পারলেন না। ধমকের স্বরে বললেন, পিঁপড়ায় কামড়ায় মানে?

রোগী পকেটে হাত দিয়ে একটুকরা কাগজ বের করে বলল, চিঠিটা পড়েন। চিঠির মধ্যে সব লেখা আছে।

কার চিঠি?

কাশেম সাহেব।

কাশেম সাহেব কে?

এমবিবিএস ডাক্তার। আমাদের অঞ্চলের। খুব ভাল ডাক্তার। উনি আপনার কাছে আমারে পাঠাইছেন। বলছেন নাম বললে আপনি চিনবেন। উনি আপনের ছাত্র।

নূরুল আফসার সাহেব কাশেম নামের কোন ছাত্রের নাম মনে করতে পারলেন না। কাশেম বহুল প্রচলিত নামের একটি। ক্লাসে প্রতি বছরই দু'একজন কাশেম থাকে। এ কোন্ কাশেম কে জানে।

স্যার চিনেছেন?

চিনি না বলাটা ঠিক হবে না। পুরানো ছাত্ররা রুগী পাঠায়। এদেরকে খুশি রাখা দরকার। কাজেই আফসার সাহেব শুকনো হাসি বললেন, হ্যাঁ চিনেছি। কি লিখেছে দেখি।

উনি স্যার আপনাকে সালাম দিয়েছেন।

আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখি, চিঠিটা দেখি।

চিঠি দেখে ডাক্তার সাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। বাঙালী জাতির সবচে বড় দোষ হল—এরা কোন জিনিস সংক্ষেপে করতে পারে না। দুই পাতার এক চিঠি ফেঁদে

বসেছে। তিনি পড়লেন।

পরম শ্রদ্ধেয় স্যার,

আমার সালাম জানবেন। আমি সেভেন্টি থ্রি ব্যাচের ছাত্র। আপনি আমাদের ফার্মাকোলজি পড়াতেন। আপনার বিষয়ে আমি সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছিলাম। সেই উপলক্ষে আপনি আপনার বাসায় আমাকে চায়ের দাওয়াত করেছিলেন।

আশা করি আপনার মনে পড়েছে। যাই হোক, আমি মকবুল সাহেবকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। মকবুল এই অঞ্চলের একজন অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তি। সে বছর চারেক ধরে অদ্ভুত এক ব্যাধিতে ভুগছে। একে ব্যাধি বলা যাবে না। কিন্তু অন্য কোন নামও আমি পাচ্ছি না। ব্যাপারটা হচ্ছে তাকে সব সময় পিঁপড়ায় কামড়ায়।

বুঝতে পারছি বিষয়টা আপনার কাছে খুবই হাস্যকর মনে হচ্ছে। শুরুতে আমার কাছেও মনে হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম এটা এক ধরনের মানসিক ব্যাধি। বর্তমানে আমার সেই ধারণা পুরোপুরি ভেঙে গেছে! আমি নিজে লক্ষ করেছি, মকবুল সাহেব বসলেই সারি বেঁধে পিঁপড়া তার কাছে আসতে থাকে।

পীর–ফকির, তাবিজ, ঝাড়–ফুঁক জাতীয় আদিভৌতিক চিকিৎসা সবই করানো হয়েছে। কোন লাভ হয়নি। আমি কোন উপায় না দেখে আপনার কাছে পাঠালাম। আপনি দয়া করে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবেন না।

বিনীত

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র

আবুল কাশেম।

ব্লু স্টার ফার্মেসি। নান্দাইল। কেন্দুয়া।

ডাক্তার সাহেব রোগীর দিকে তাকালেন। রোগী পাথরের মত মুখ করে বসে আছে। গায়ে ফতুয়া ধরনের জামা। পরনে লুঙ্গি। অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তির পোশাক নয়।

ডাক্তার সাহেব কি বলবেন বুঝতে পারলেন না। কিছু—একটা বলতে হয়। মকবুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। এই জাতীয় উদ্ভট যন্ত্রণার কোন মানে হয়?

পিঁপড়া কামড়ায় আপনাকে?

জ্বি স্যার। কোন এক জায়গায় বসে থাকলেই পিঁপড়া এসে ধরে।

নূরুল আফসার সাহেব একবার ভাবলেন বলবেন, আপনি কি রসোগোল্লা না–কি যে পিঁপড়া ছেঁকে ধরবে? শেষ পর্যন্ত বললেন না।

বড় কষ্টে আছি স্যার। যদি ভাল করে দেন সারাজীবন কেনা গোলাম হইয়া থাকব। টাকা–পয়সা কোন ব্যাপার না, স্যার। টাকা যা লাগে লাগুক।

আপনার কি অনেক টাকা?

জ্বি স্যার।

কী পরিমাণ টাকা আছে?

রোগী কোন জবাব দিল না। রোগীর সঙ্গী বলল, মকবুল ভাইয়ের কাছে টাকা–পয়সা কোন ব্যাপার না। লাখ দুই লাখ উনার হাতে ময়লা।

নূরুল আফসার সাহেব এই প্রথম খানিকটা কৌতূহলী হলেন। লাখ টাকা ফতুয়া–গায়ে লুঙ্গী–পরা এই লোকটির হাতের ময়লা–এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তিনি

নিজেও ধনবান ব্যক্তি। ফিক্সড ডিপোজিডে তাঁর এগারো লাখ টাকার মত আছে। এই টাকা সঞ্চয় করতে গিয়ে জীবন পানি করে দিতে হয়েছে। ভোর ছ'টা থেকে রাত বারোটা—এক মুহূর্তের বিশ্রাম নেই।

একমাত্র ছুটির দিন শুক্রবারটাও তিনি কাজে লাগান। সকালের ফ্লাইটে চিটাগাং যান, লাস্ট ফ্লাইটে ফিরে আসেন। ওখানকার একটা ক্লিনিকে বসেন। ঐ ক্লিনিকের তিনি কনসালটিং ফিজিসিয়ান। আর এই লোককে দেখে তো মনে হয় না সে কোন কাজকর্ম করে। নির্বোধের মত এই লোক এত টাকা করে কী করে? নূরুল আফসার সাহেবের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

মকবুল ক্ষীণ স্বরে বলল, রোগটা যদি সারায়ে দেন।

এটা কোন রোগ না। আমি এমন কোন রোগের কথা জানি না— যে রোগে দুনিয়ার পিঁপড়া এসে কামড়ায়। অসুখটা আপনার মনে। আমি সাইকিয়াট্রিস্টের ঠিকানা লিখে দিচ্ছি— তাঁর সঙ্গে কথা বলুন। আপনার যে সমস্যা এই সমস্যার সমাধান আমার কাছে নেই।

নূরুল আফসার সাহেব বাক্যটা পুরোপুরি শেষ করলেন না। কারণ একটা অদ্ভুত দৃশ্যে তাঁর চোখ আটকে গেল। তিনি দেখলেন, টেবিলের উপর রাখা মকবুলের ডান হাতের দিকে এক সারি লাল পিঁপড়া এগুচ্ছে। পিঁপড়ারা সচরাচর এক লাইনে চলে, এরা তিনটি লাইন করে এগুচ্ছে।

ডাক্তার সাহেবের দৃষ্টি লক্ষ্য করে মকবুলও তাকাল পিঁপড়ার সারির দিকে। সে কিছু বলল না বা হাতও সরিয়ে নিল না।

নূরুল আফসার সাহেব বললেন, এই পিঁপড়াগুলি কি আপনার দিকে আসছে?

জ্বি স্যার।

বলেন কী?

পায়েও পিঁপড়া ধরেছে। এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসতে পারি না স্যার।

নূরুল আফসার সাহেব কাছে এগিয়ে এলেন। উঁচু হয়ে বসলেন। সত্যি সত্যি দু'সারি পিঁপড়া লোকটির পা'র দিকে এগুচ্ছে।

মকবুল সাহেব।

জ্বি স্যার।

আমার একটা জরুরী কাজ আছে, চলে যেতে হচ্ছে। আপনি কি কাল একবার আসবেন?

অবশ্যই আসব। যার কাছে যাইতে বলেন যাব। বড় কষ্টে আছি স্যার। রাতে ঘুমাইতে পারি না। নাকের ভিতর দিয়ে পিঁপড়া ঢুকে যায়।

আপনি কাল আসুন। কাল কথা বলব।

জ্বি আচ্ছা।

মকবুল উঠে দাঁড়াল। পর মুহূর্তেই যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্যে নূরুল আফসার সাহেব মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর কাছে মনে হল মকবুল কিছুক্ষণের জন্য হলেও বদ্ধ উম্মাদ হয়ে গেছে। চিন্তা ও বিচারশক্তি পুরোপুরি লোপ পেয়েছে। তিনি দেখলেন মকবুল হিংস্র ভঙ্গিতে লাফিয়ে, পা ঘসে ঘসে পিঁপড়া মারার চেষ্টা করছে। এক

পর্যায়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেবিলে, দু'হাতে পিষে ফেলল পিঁপড়ার সারি। মকবুলের মুখ ঘামে চটচট করছে। চোখের তারা ঈষৎ লালাভ। মুখে হিসহিস শব্দ করছে এবং নিচু গলায় বলছে, হারামজাদা, হারামজাদা।

তার সঙ্গী কিছুই বলছে না। মাথা নিচু করে দেয়াশলাইর কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁচাচ্ছে। তার ভাবভঙ্গি থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এ জাতীয় ঘটনার সঙ্গে সে পরিচিত। এই ঘটনায় সে অস্বাভাবিক কিছু দেখছে না।

নূরুল আফসার সাহেব শালীর জন্মদিনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন। রোগীর দিকে হতভম্ব চোখে তকিয়ে রইলেন। তাঁর দু'জন অ্যাসিসটেন্টও ছুটে এসেছে। তারা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখে–মুখে বিস্ময়ের চেয়ে ভয় বেশি।

মকবুল হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেল। নিচু গলায় বলল, স্যার, মনে কিছু নিবেন না। এই পিঁপড়ার ঝাঁক আমার জেবন শেষ কইরা দিছে। হারামজাদা পিঁপড়া। এক গেলাস ঠাণ্ডা পানি দিবেন?

ডাক্তার সাহেবের অ্যাসিসটেন্ট অতি দ্রুত ফ্রিজ থেকে পানির বোতল বের করে নিয়ে এল। একজন ভয়ংকর পাগলের পাগলামি হঠাৎ থেমে গেছে এই আনন্দেই সে আনন্দিত।

মকবুল পানির গ্লাস হাতে নিয়ে বসে রইল। পানি মুখে দিল না। মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে বলল, যেখানে যাই সেইখানে পিঁপড়া, কি করব কন। যে খাটে ঘুমাই সেই খাটের পায়ার নিচে বিরাট বিরাট মাটির সরা।। সরা ভর্তি পানি। তাতেও লাভ হয় না।

লাভ হয় না?

জ্বি না। ক্যামনে ক্যামনে জানি বিছানায় পিঁপড়া উঠে। ঘন্টা ঘন্টায় বিছানার চাদর বদলাইতে হয়।

বলেন কি?

সত্যি কথা বলতেছি জনাব। একবর্ণ মিথ্যা না। যদি মিথ্যা হয় তা হইলে যেন আমার শরীরে কুষ্ঠ হয়। আমি জনাব এক জায়গায় বেশিক্ষন থাকতেও পারি না। জায়গা বদল করতে হয়। আমার জীবন শেষ।

ডাক্তার সাহেব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। যে লোকটিকে শুরুতে মনে হয়েছিল কথা বলতে পারে না, এখন দেখা যাচ্ছে সে প্রচুর কথা বলতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। গ্রামের লোকজনের প্রাথমিক ইনহিবিশন কেটে গেলে প্রচুর কথা বলে। প্রয়োজনের কথা বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনের কথাই বেশি বলে।

চিকিৎসায় কোন ক্রুটি করি নাই জনাব। কেরোসিন তেলে কর্পুর দিয়ে সেই তেল শরীরে মাখছি যদি গন্ধে পিঁপড়া না আসে। প্রথম দুই–একদিন লাভ হয়, তারপর হয় না। পিঁপড়া আসে। এমন জিনিস নাই যে শরীরে মাখি নাই। যে যা বলেছে মাখছি। একজন বলল, বাদুরের গু শরীরে মাখলে আরাম হইব। সেই বাদুরের গু'ও মাখলাম। এর চেয়ে জনাব আমার মরণ ভাল।

ডাক্তার সাহেব তার অ্যাসিসটেন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাসায় টেলিফোন করে দাও যে আমি ঝামেলায় আটকে পড়েছি। আসতে দেরি হবে। আর আমাদের চা দাও।

আপনি চা খান তো?

জ্বি চা খাই।

চা খেতে খেতে বলুন কিভাবে এটা শুরু হল, প্রথম কখন পিঁপড়া আপনার দিকে আকৃষ্ট হল।

একটু গোপনে বলতে চাই জনাব।

গোপনে বলার ব্যাপার আছে কি?

জ্বি আছে।

বেশ। গোপনেই বলবেন। আগে চা খান।

.

লোকটি চা খেল নিঃশব্দে। চা খাবার সময় একটি কথাও বলল না। তার কথা বলার ইচ্ছা সম্ভবত ঢেউয়ের মত আসে। ঢেউ যখন আসে তখন প্রচুর বকবক করে, ঢেউ থেমে গেলে চুপচাপ হয়ে যায়। তখন কথা বলে তার সঙ্গী। এখন সঙ্গীই কথা বলছে—

ডাক্তার সাব, সবচে' বেশি ফল হয়েছে যে চিকিৎসায় সেইটাই তো বলা হয় নাই। মকবুল ভাই, ঐ চিকিৎসার কথা বলেন।

তুমি বল।

এই চিকিৎসা মকবুল ভাই নিজেই বাইর করছে। বিষে বিষক্ষয় চিকিৎসা। গুড়ের গন্ধে পিঁপড়া সবচে বেশি আসে। মকুবল ভাই করলেন কি, সারা শইলে গুড় মাখলেন। এতে লাভ হইছিল। সাতদিন কোন পিঁপড়া আসে নাই।

মকবুল গম্ভীর গলায় বলল, সাতদিন না পাঁচদিন।

ডাক্তার সাহেব বললেন, পাঁচদিন পরে আবার পিঁপড়া আসা শুরু হল?

জ্বি।

পিঁপড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে মনে হয় অনেক কিছু করেছেন।

জ্বি। নদীর মাঝখানে নৌকা নিয়া কয়েকদিন ছিলাম। তিন দিন আরামে ছিলাম। চাইর দিনের দিন পিঁপড়া ধরল।

সেখানে পিঁপড়া গেল কিভাবে?

জানি না জনাব। অভিশাপ।

কিসের অভিশাপ।

আপনারে গোপনে বলতে চাই।

ডাক্তার সাহেব গোপনে বলার ব্যবস্থা করলেন। পুরো ব্যাপারটায় তিনি এখন উৎসাহ পেতে শুরু করছেন। শালীর জন্মদিনের কথা মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে। খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছেন। এই পর্যন্তই। কোন রোগীর ব্যাপারে এ জাতীয় কৌতূহল তিনি এর আগে বোধ করেননি। অবশ্যি এই লোকটিকে রোগী বলতেও বাধছে। কাউকে পিঁপড়া ছেঁকে ধরে এটা নিশ্চয়ই কোন রোগ–ব্যাধির পর্যায়ে ফেলা যাবে না।

ঘর থেকে সবাইকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। মকবুলের সঙ্গীও নেই। দরজা ভেজানো। মকবুল নিচু গলায় কথা শুরু করল—

জনাব, আপনেরে আমি আগেই বলছি আমি টাকা–পয়সাওয়ালা লোক। আমাদের

টাকা–পয়সা আইজ–কাইলের না। ব্রিটিশ আমলে আমার দাদাজান পাকা দালান দেন। দাদাজানের দুইটা হাতী ছিল। একটার নাম ময়না, অন্যটার নাম সুরভি। দুইটাই মাদী হাতী।

ঐ প্রসঙ্গ থাক, আপনার পিঁপড়ার প্রসঙ্গে আসুন।

আসতেছি। আমি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক। টাকা–পয়সা, ক্ষমতা এইসব জিনিস বেশি থাকলে মানুষের স্বভাব–চরিত্র ঠিক থাকে না। আমারো ঠিক ছিল না। আপনারা যারে চরিত্র–দোষ বলেন তাই হইল। পনের–ষোল বছর বয়সেই। বিরাট বাড়ি–সুন্দরী মেয়েছেলের অভাব ছিল না। দাসী–বাঁদি ছিল। দরিদ্র আত্মীয়–স্বজনের মেয়ে–বউরা ছিল।

আমারে একটা কঠিন কথা বলার বা শাসন করার কেউ ছিল না। আমার মা অবশ্য জীবিত ছিলেন। কেউ কেউ তাঁর কাছে বিচার নিয়ে গেছে। লাভ হয় নাই। উল্টা আমার ধমক খাইছে।

আপনি বিয়ে করেননি?

জ্বি বিবাহ করেছি। বিবাহ করব না কেন? দুটি বিবাহ করেছি। সন্তানদি আছে স্বভাব নষ্ট হইলে বিয়ে–সাদী করলেও ফায়দা হয় না। মেয়েছেলে দেখলেই .....

আপনি আসল জায়গায় আসুন। আজেবাজে কথা বলে বেশি সময় নষ্ট করছেন।

জ্বি আসতেছি। বছর পাঁচেক আগে আমার দূর–সম্পর্কীয় এক বোনের মেয়ের উপর আমার চোখ পড়ল। চইদ্দ পনের বছর বয়স। গায়ের রঙ একটু ময়লা, কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল। আমার চরিত্র তো কারো অজানা না। মেয়ের মা মেয়েকে আগলায়ে রাখে। খুবই বজ্জাত মা, মেয়েকে নিয়ে আমার মা'র ঘরে মেঝেতে ঘুমায়। এত কিছু কইরাও লাভ হইল না। এক রাতে ঘটনা ঘটে গেল।

কি বললেন, ঘটনা ঘটে গেল?

জ্বি। আশ্চর্য ব্যাপার। আপনি যেভাবে বলছেন তাতে মনে হচ্ছে খুবই তুচ্ছ একটা ব্যাপার।

জিনিসটা তুচ্ছই । কিছুই না। হে হে হে।

হাসবেন না। হাসির কোন ব্যাপার না।

জ্বি আচ্ছা। তারপর কি হল— ঐ বজ্জাত মা সেই রাতেই মেয়েটারে ইঁদুর–মারা বিষ খাওয়াইয়া দিল। আর নিজে একটা দড়ি নিয়ে বাড়ির পিছনে একটা আমগাছে ফাঁস নিল। আমারে বিপদে ফেলার চেষ্টা, আর কিছু না। মাগী চূড়ান্ত বজ্জাত। আমি চিন্তায় পড়লাম। দুইটা মিত্যু সোজা কথা না। থানা–পুলিশ হবে। পুলিশ তো এই জিনিসটাই চায়। এরা বলবে খুন করা হয়েছে।

আপনি খুন করেননি?

আরে না। খুন করব কি জন্যে? আর যদি খুনের দরকারও হয় নিজের ঘরে খুন করব? কাউরে খুন করতে হইলে জায়গার অভাব আছে? খুন করতে হয় নদীর উপরে। রক্ত ধুইয়ে ফেলা যায়। তারপর লাশ বস্তার ভিতর বইরা চুন মাখায়ে চার–পাঁচটা ইট বস্তার ভিতর দিয়ে বিলে ফালায়ে দিতে হয়। এই জন্মের জন্যে নিশ্চিন্ত।

কোনো সম্বুন্ধির পুত কিছু জানব না।

আপনি খুনও করেছেন?

জ্বি না। দরকার হয় নাই। যেটা বলতেছিলাম সেইটা শুনেন, ঘরে দুইটা লাশ। আমি বললাম, খবরদার, লাশের গায়ে কেউ হাত দিবা না। যে রকম আছে সে রকম থাক, আমি নিজে গিয়ে থানার ওসি সাহেবেরে আনতেছি, ওসি সাহেব আইয়্যা যা করবার করব।

থানা আমার বাড়ি থাইক্যা পনের মাইল দূর। পানসি নৌকা নিয়ে গেলাম। দারোগা সাহেব আর থানা স্টাফের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা নজরানা নিয়ে গেলাম। গিয়া দেখি বিরাট সমস্যা। দারোগা সাব গিয়েছেন বোয়ালখালী ডাকাতি মামলার তদন্তে। ফিরলেন পরের দিন। তারে নিয়ে আমার বাড়িতে আসতে লাগল তিন দিন।

বর্ষাকাল। গরমের দিন। তিন দিনেই লাশ গেছে পচে। বিকট গন্ধ। দারোগা সাবরে নিয়া কাঁঠাল গাছের কাছে গিয়া দেখি অদ্ভুত দৃশ্য। লাখ লাখ লাল পিঁপড়া লাশের শরীরে। মনে হইতেছে মাগীর সারা শইলে লাল চাদর।

মেয়েটারও একই অবস্থা। মুখ হাত পা কিছুই দেখার উপায় নাই। পিঁপড়ায় সব ঢাকা। মাঝে মাঝে সবগুলি পিঁপড়া যখন একসঙ্গে নড়ে, তখন মনে হয় লাল চাদর কেউ যেন ঝাড়া দিল।

ডাক্তার সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, আপনি তো দেখি খুবই বদলোক।

জ্বি না, আমার মত টেকাপয়সা যারার থাকে তারা আরো বদ হয়। আমি বদ না। তারপর কি ঘটনা সেইটাই শুনেন-আমি একটা সিগারেট ধরাইলাম। সিগারেটের আগুন ফেলার সাথে সাথে মেয়েটার শরীরের সবগুলি পিঁপড়া নড়ল। মনে হল যে একটা বড় ঢেউ উঠল। তারপর সবগুলি পিঁপড়া একসঙ্গে মেয়েটারে ছাইড়া মাটিতে নামল। মেয়েটার চোখ মুখ সব খাইয়া ফেলেছে- জায়গায় জায়গায় হড্ডি বের হয়ে গেছে। দারোগা সাহেব রুমাল দিয়ে নাক চেপে ধরে বললেন, মাবুদে এলাহী। তারপর অবাক হয়ে দেখি সবগুলো পিঁপড়া একসঙ্গে আমার দিকে আসতেছে। ভয়ংকর অবস্থা। আমি দৌড় দিয়ে বাইরে আসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে পিঁপড়াগুলি বাইরে আসল। মনে হইল আমারে খুঁজতেছে। সেই থাক্যা শুরু। যেখানে যাই পিঁপড়া। জনাব, আপনার এই ঘরে কি সিগারেট খাওয়া যায়? খাওয়া গেলে একটা সিগারেট খাইতে চাই।

খান।

..শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

মকবুল সিগারেট ধরাল। তার মুখ বিষন্ন। সে আনাড়িদের মত ধোঁয়া ছাড়ছে। খুক খুক করে কাশছে। খানিকটা দম নিয়ে বলল, আমার কাশি ছিল না। এখন কাশি হয়েছে। নাকের ভিতর দিয়া পিঁপড়া ঢুকে গেছে ফুসফুসে। ওরা ঐখানেই বসবাস করে। ক্যামনে বুঝলাম জানেন? কাশির সাথে রক্ত আসে। আর মরা পিঁপড়া।

ডাক্তার সাহেব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

মকবুল সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, সিগারেট খাইতেছি যাতে ভাল মত কাশি উঠে। কাশি উঠলে কাশির সাথে পিঁপড়ার ডিম বাইর হবে। আপনি দেখবেন নিজের চোখে। আমি ঘোষণা দিচ্ছি, যে আমারে পিঁপড়ার হাত থাইক্যা বাঁচাইব তারে আমি নগদ দুই লাখ দিব। আমি বদ লোক হইতে পারি কিন্তু আমি কথার খেলাপ করি না।

আমি টাকা সাথে নিয়া আসছি। আপনে আমারে বাঁচান।

ডাক্তার সাহেব কিছু বললেন না। তিনি তাঁর বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপরের কাচের দিকে তাকিয়ে আছেন। মকবুলের বাম হাত টেবিলের উপর। দুই সারি পিঁপড়া টেবিলের দু'প্রান্ত থেকে সেই হাতের দিকে এগুচ্ছে। মকবুলের ও সেই দিকে চোখ পড়ল। সে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনের কিছু করা সম্ভব না। ঠিক না ডাক্তার সাব?

হ্যাঁ ঠিক।

আমি জানতাম। আমর মরণ পিঁপড়ার হাতে।

মকবুল মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে আসা পিঁপড়ার সারি দু'টির দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ চকচক করছে। সে তার বাঁ-হাত আরেকটু এগিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বলল,- নে খা।

পিঁপড়ারা মনে হল একটু থমকে গেল। গা বেয়ে উঠল না-কিছুক্ষণ অনিশ্চয়তায় ভুগল।

মকবুল বলল, নিজ থাইক্যা খাইতে দিলে এরা কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে, সঙ্গে সঙ্গে শরীরে উঠে না। শলা-পরামর্শ করে। এই দেহেন ডাক্তার সাব-উঠতেছে না।

তাই তো দেখছি।

দুই এক মিনিটের ব্যাপার। দুই এক মিনিটে শলা-পরামর্শ শেষ হইব, তখন শইলে উঠা শুরু হইব।

হলও তাই। ডাক্তার সাহেব লক্ষ্য করলেন, পিঁপড়ার দল মকবুলের বাঁ হাতেই উঠতে শুরু করেছে। দু'টি সারি ছাড়াও নতুন এক সাড়ি পিঁপড়া রওনা হয়েছে। এই পিঁপড়াগুলির মুখে ডিম। ডাক্তার সাহেব ভেবে পেলেন না, মুখে ডিম নিয়ে পিঁপড়াগুলি যাচ্ছে কেন? এরা চায় কী? কে তাদের পরিচালিত করছে। কে সেই সূত্রধর?



ছায়াসঙ্গী

প্রতি বছর শীতের সময় ভাবি কিছুদিন গ্রামে কাটিয়ে আসব। দলবল নিয়ে যাব— হৈচৈ করা যাবে। আমার বাচ্চারা কখনো গ্রাম দেখে নি— তারা ভারি খুশি হবে। পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি করতে পারবে। শাপলা ফুল শুধু যে মতিঝিলের সামনেই ফুটে না, অন্যান্য জায়গাতেও ফুটে, তাও স্বচক্ষে দেখবে।

আমার বেশির ভাগ পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারি না। এটা কেমন করে জানি লেগে গেল। একদিন সত্যি সত্যি রওনা হলাম।

আমাদের গ্রামটাকে অজ পাড়াগাঁ বললেও সম্মান দেখানো হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন সুন্দর সময়েও সেখানে পৌঁছতে হয় গরুর গাড়িতে। বর্ষার সময় নৌকা, তবে মাঝখানে একটা হাওড় পড়ে বল সেই যাত্রা অগস্ত্যযাত্রার মত।

অনেকদিন পর গ্রামে গিয়ে ভাল লাগল। দেখলাম, আমার বাচ্চাদের আনন্দ বর্ধনের সব ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে। কোত্থেকে যেন একটা হাড়-জিরজিরে বেতো ঘোড়া জোগাড় করা হয়েছে। এ ঘোড়া নড়াচড়া করে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। খুব বেশি বিরক্ত হলে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মত একটা শব্দ করে এবং লেজটা নাড়ে। বাচ্চারা এত বড় একটা জীবন্ত খেলনা পেয়ে মহাখুশি, দুতিনজন এক সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে ওঠে বসে থাকে।

তাদের অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবও জুটে গেল। যেখানেই যায় তাদের সঙ্গে গোটা পঞ্চাশেক ছেলেপুলে থাকে। আমার বাচ্চারা যা করে তাতেই তারা চমৎকৃত হয়। আমার বাচ্চারা তাদের বিপুল জনপ্রিয়তায় অভিভূত। তারা যাবতীয় প্রতিভা দেখাতে শুরু করল— কেউ কবিতা বলছে, কেউ গান, কেউ ছড়া।

আমি একগাদা বই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার পরিকল্পনা— পুরোপুরি বিশ্রাম নেয়া। শুয়ে-বসে বই পড়া, খুব বেশি ইচ্ছা করলে খাতা-কলম নিয়ে বসা। একটা উপন্যাস অর্ধেকের মত লিখেছিলাম, বাকিটা কিছুতেই লিখতে ইচ্ছা করছিল না। পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। নতুন পরিবেশে যদি লিখতে ইচ্ছা করে।

প্রথম কিছুদিন বই বা লেখা কোনটাই নিয়ে বসা গেল না। সারাক্ষণই লোকজন

আসছে। তারা অত্যন্ত গম্ভীর গলায় নানান জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনায় উৎসাহী। এসেই বলবে— দেশের অবস্থাডা কি কন দেহি ছোড মিয়া। বড়ই চিন্তাযুক্ত আছি। দেশের হইলডা কি? কি দেশ ছিল আর কি হইল!

দিন চার-পাঁচেকের পর সবাই বুঝে গেল দেশ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। গল্পগুজবও তেমন করতে পারি না। তারা আমাকে রেহাই দিল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। গ্রামের নতুন পরিবেশের কারণেই হোক বা অন্য কারণেই হোক, আমি লেখালেখি কাটাকুটি করি। সন্ধ্যায় স্ত্রীকে সঙ্গে করে বেড়াতে বের হই। চমৎকার লাগে। প্রায় রাতেই একজন দুজন কর 'গাতক' আসে। এরা জ্যোৎস্নাভেজা উঠোনে বসে চমৎকার গান ধরে—

"ও মনা
এই কথাটা না জানলে প্রাণে বাঁচতাম না।
না না না— আমি প্রাণে বাঁচতাম না।"

সময়টা বড় চমৎকার কাটতে লাগল। লেখার ব্যাপারে আগ্রহ বাড়তেই লাগল। সারাদিনই লিখি।

এক দুপুরের কথা— একমনে লিখছি। জানালার ওপাশে খুট করে শব্দ হল। তাকিয়ে দেখি, খালি গায়ে রোগামত দশ-এগার বছরের একটা ছেলে গভীর আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে আগেও দেখেছি। জানালার ওপাশ থেকে গভীর কৌতূহলে সে আমাকে দেখে। চোখে চোখ পড়লেই পালিয়ে যায়। আজ পালাল না।

আমি বললাম— কি রে?

সে মাথাটা চট করে নামিয়ে ফেলল।

আমি বললাম— চলে গেলি নাকি?

ও আড়াল থেকে বলল— না।

'নাম কি রে তোর?'

'মন্তাজ মিয়া।'

'আয়, ভেতরে আয়।'

'না।'

আর কোন কথাবার্তা হল না। আমি লেখায় ডুবে গেলাম। ঘুঘু-ডাকা শ্রান্ত দুপুরে লেখালেখির আনন্দই অন্য রকম। মন্তাজ মিয়ার কথা ভুলে গেলাম।

পরদিন আবার এই ব্যাপার। জানালার ওপাশে মন্তাজ মিয়া। বড় বড় কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম— কি ব্যাপার মন্তাজ মিয়া? আয় ভেতরে।

সে ভেতরে ঢুকল।

আমি বললাম, থাকিস কোথায়?

উত্তরে পোকা-খাওয়া দাঁত বের করে হাসল।

'স্কুলে যাস না?'

আবার হাসি। আমি খাতা থেকে একটা সাদা কাগজ ছিঁড়ে তার হাতে দিলাম। সে তার এই বিরল সৌভাগ্যে অভিভূত হয়ে গেল। কি করবে বুঝতে পারছে না। কাগজটার

গন্ধ শুঁকল। গালের উপর খানিকক্ষণ চেপে ধরে রেখে উল্কার বেগে বেরিয়ে গেল।

রাতে খেতে খেতে আমার ছোট চাচা বললেন— মন্তাজ হারামজাদা তোমার কাছে নাকি আসে? আসলে একটা চড় দিয়ে বিদায় করবে।

'কেন?'

'বিরাট চোর। যাই দেখে তুলে নিয়ে যায়। ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিবে না। দুই দিন পরপর মার খায়, তাতেও হুঁশ হয় না। তোমার এখানে এসে করে কি?'

'কিছু করে না?'

'চুরির সন্ধানে আছে। কে জানে এর মধ্যে হয়ত তোমার কলম-টলম নিয়েছে।'

'না, কিছু নেয় নি।'

'ভাল করে খুঁজে-টুজে দেখ। কিছুই বলা যায় না। ঐ ছেলের ঘটনা আছে।'

' কি ঘটনা?'

'আছে অনেক ঘটনা। বলব এক সময়।'

পরদিন সকালে যথারীতি লেখালেখি শুরু করেছি। হৈচৈ শুনে বের হয়ে এলাম। অবাক হয়ে দেখি, মন্তাজ মিয়াকে তিন-চার জন চ্যাংদোলা করে নিয়ে এসেছে। ছেলেটা ফুঁপাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে প্রচণ্ড মার খেয়েছে। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে। একদিকের গাল ফুলে আছে।

আমি বললাম, কি ব্যাপার?

শাস্তিদাতাদের একজন বলল, দেখেন তো এই কলমটা আপনার কি-না? মন্তাজ হারামজাদার হাতে ছিল।

দেখলাম কলমটা আমারই। চার-পাঁচ টাকা দামের বল পয়েন্ট। এমন কোন মহার্ঘ বস্তু নয়। আমার কাছে চাইলেই দিয়ে দিতাম। চুরি করার প্রয়োজন ছিল না। মনটা একটু খারাপই হল। বাচ্চা বয়সে ছেলেটা এমন চুরি শিখল কেন? বড় হয়ে এ করবে কি?

'ভাইসাব, কলমটা আপনার?'

'হ্যাঁ। তবে আমি এটা ওকে দিয়ে দিয়েছি। ছেড়ে দিন। বাচ্চা ছেলে, এত মারধর করেন কেন? মারধর করার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবেন না?'

শাস্তিদাতা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, এই মাইরে ওর কিছু হয় না। এইডা এর কাছে পানিভাত। মাইর না খাইলে এর ভাত হজম হয় না।

মন্তাজ মিয়া বিস্মিত চোখে আমাকে দেখছে। তাকে দেখেই মনে হল সে তার ক্ষুদ্র জীবনে এই প্রথম একজনকে দেখছে যে চুরি করার পরও তাকে চোর বলে নি। মন্তাজ মিয়া নিঃশব্দে বাকি দিনটা জানালার ওপাশে বসে রইল। অন্যদিন তার সঙ্গে দু-একটা কথাবার্তা বলি, আজ একটা কথাও বলা হয় না। মেজাজ খারাপ হয়েছিল। এই বয়সে একটা ছেলে চুরি শিখবে কেন?

মন্তাজ মিয়ার যে একটা বিশেষ ঘটনা আছে তা জানলাম আমার ছোট চাচীর কাছে। চুরির ঘটনারও দুদিন পর। গ্রামের মানুষদের এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কোন্ ঘটনা যে গুরুত্বপূর্ণ কোন্টা তুচ্ছ তা এরা বুঝতে পারে না। মন্তাজ মিয়ার জীবনের এত বড় একটা ব্যাপার কেউ আমাকে এতদিন বলে নি অথচ তুচ্ছ সব বিষয় অনেকবার করে

শোনা হয়ে গেছে।

মন্তাজ মিয়ার ঘটনাটা এই—

তিন বছর আগে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি মন্তাজ মিয়া দুপুরে প্রবল জ্বর নিয়ে বাড়ি ফেরে। সেই জ্বরের প্রকোপ এতই বেশি যে শেষ পর্যন্ত মন্তাজ মিয়ার হতদরিদ্র বাবা একজন ডাক্তারও নিয়ে এলেন। ডাক্তার আনার কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্তাজ মিয়া মারা গেল। গ্রামে জন্ম এবং মৃত্যু দুটাই বেশ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়। মন্তাজ মিয়ার মা কিছুক্ষণ চিৎকার করে কাঁদল। তার বাবাও খানিকক্ষণ 'আমার পুত কই গেল রে' বলে চেঁচিয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল। বেঁচে থাকার প্রবল সংগ্রামে তাদের লেগে থাকতে হয়. পুত্রশোকে কাতর হলে চলে না।

মরা মানুষ যত তাড়াতাড়ি কবর দিয়ে দেয়া হয় ততই নাকি ছোয়াব এবং কবর দিতে হয় দিনের আলো থাকতে থাকতে। কাজেই জুম্মা ঘরের পাশে বাদ আছর মন্তাজ মিয়ার কবর হয়ে গেল। সব কিছুই ঘটল খুব স্বাভাবিকভাবে।

অস্বাভাবিক ব্যাপারটা শুরু হল দুপুর রাতের পর, যখন মন্তাজ মিয়ার বড় বোন রহিমা কলমাকান্দা থেকে উপস্থিত হল। কলমাকান্দা এখান থেকে একুশ মাইল। এই দীর্ঘ পথ একটি গর্ভবতী মহিলা পায়ে হেঁটে চলে এল এবং বাড়িতে পা দিয়েই চেঁচিয়ে বলল, তোমরা করছ কি? মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে। কবর খুঁইড়া তারে বাইর কর। দিরং করবা না।

বলাই বাহুল্য, কেউ তাকে পাত্তা দিল না। শোকে-দুঃখে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। কবর দেয়ার পর নিকট আত্মীয়-স্বজনরা সব সময় বলে— "ও মরে নাই।" কিন্তু মন্তাজ মিয়ার বোন রহিমা এই ব্যাপারটা নিয়ে এতই হৈচৈ শুরু করল যে সবাই বাধ্য হল মৌলানা সাহেবকে ডেকে আনতে।

রহিমা মৌলানা সাহেবের পায়ে গিয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে — আপনে এরে বাঁচান। আপনে না বললে কবর খুঁড়ত না। আপনে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি পাও ছাড়তাম না। মৌলানা সাহেব অনেক চেষ্টা করেও রহিমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। রহিমা বজ্র আঁটুনিতে পা ধরে বসে রইল।

মৌলানা সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন — বাঁইচ্যা আছে বুঝলা ক্যামনে?

রহিমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি জানি।

গ্রামের মৌলানারা অতি কঠিন হৃদয়ের হয় বলে আমাদের একটা ধারণা আছে। এই ধারণা সত্যি নয়। মৌলানা সাহেব বললেন — প্রয়োজনে কবর দ্বিতীয়বার খোঁড়া জায়েজ আছে। এই মেয়ের মনের শান্তির জন্যে এটা করা যায়। হাদিস শরীফে আছে --

কবর খোঁড়া হল।

ভয়াবহ দৃশ্য!

মন্তাজ মিয়া কবরের পাশে হেলান দিয়ে বসে আছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে। হঠাৎ চোখে প্রবল আলো পড়ায় চোখ মেলতে পারছে না। কাফনের কাপড়ের একখণ্ড লুঙ্গির মত পেঁচিয়ে পরা। অন্য দুটি খণ্ড সুন্দর করে ভাঁজ করা।

অসংখ্য মানুষ জমা হয়ে আছে। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে কারো মুখে কোন কথা সরল না। মৌলানা সাহেব বললেন — কি রে মন্তাজ?

মন্তাজ মৃদু স্বরে বলল, পানির পিয়াস লাগছে।

মৌলানা সাহেব হাত বাড়িয়ে তাকে কবর থেকে তুললেন।

এই হচ্ছে মন্তাজ মিয়ার গল্প। আমি আমার এই জীবনে অদ্ভুত গল্প অনেক শুনেছি। এ রকম কখনো শুনি নি।

ছোট চাচাকে বললাম, মন্তাজ তারপর কিছু বলে নি? অন্ধকার কবরে জ্ঞান ফিরবার পর কি দেখল না দেখল এইসব?

ছোট চাচা বললেন — না। কিচ্ছু কয় না। হারামজাদা বিরাট বজ্জাত।

'জিজ্ঞেস করেন নি কিছু?'

'কত জনে কত জিজ্ঞেস করছে। এক সাংবাদিকও আসছিল। ছবি তুলল। কত কথা জিজ্ঞেস করল — একটা শব্দও করে না। হারামজাদা বদের হাড্ডি।'

আমি বললাম, কবর থেকে ফিরে এসেছে — লোকজন তাকে ভয়-টয় পেত না?

'প্রথম প্রথম পাইত। তারপর আর না। আল্লাহ্‌তায়ালার কুদরত। আল্লাহ্‌তায়ালার কেরামতি আমরা সামান্য মানুষ কি বুঝব কও?'

'তা তো বটেই। আপনারা তার বোন রহিমাকে জিজ্ঞেস করেন নি সে কি করে বুঝতে পারল মন্তাজ বেঁচে আছে?'

'জিজ্ঞেস করার কিছু নাই। এইটাও তোমার আল্লাহ্‌র কুদরত। উনার কেরামতি।'

ধর্ম-কর্ম করুক বা না করুক গ্রামের মানুষদের আল্লাহ্‌তালার 'কুদরত এবং কেরামতির' উপর অসীম ভক্তি। গ্রামের মানুষদের চরিত্রে চমৎকার সব দিক আছে। অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এরা প্রচুর মাতামাতি করে, আবার অনেক বড় বড় ঘটনা হজম করে। দার্শনিকের মত গলায় বলে, 'আল্লাহ্‌র কুদরত'।

আমি ছোট চাচাকে বললাম, রহিমাকে একটু খবর দিয়ে আনানো যায় না? ছোট চাচা বিস্মিত হয়ে বললেন কেন?

'কথা বলতাম।'

'খবর দেওয়ার দরকার নাই। এম্নেই আসবে।'

'এম্নিতেই আসবে কেন?'

ছোট চাচা বললেন — তুমি পুলাপান নিয়া আসছ। চাইরদিকে খবর গেছে। এই গেরামের যত মেয়ের বিয়ে হইছে সব অখন নাইওর আসবে। এইটাই নিয়ম।

আমি অবাকই হলাম। সত্যি সত্যি এটাই নাকি নিয়ম। গ্রামের কোন বিশিষ্ট মানুষ আসা উপলক্ষে গ্রামের সব মেয়েরা নাইওর আসবে। বাপের দেশে আসার এটা তাদের একটা সুযোগ। এই সুযোগ তারা নষ্ট করবে না।

আমি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ কি এসেছে?

'আসব না মানে? গেরামের একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে না?'

আমি ছোট চাচাকে বললাম, আমাদের উপলক্ষে যেসব মেয়েরা নাইওর আসবে তাদের প্রত্যেককে যেন একটা করে দামি শাড়ি উপহার হিসেবে দেয়া হয়। একদিন খুব যত্ন করে দাওয়াত খাওয়ানো হয়।

'মজার কথা — খালি হাসি আসে।'

বলতে বলতে মন্তাজ মিয়া ফিক্ করে হেসে ফেলল।

আমি বললাম, কি রকম মজার কথা'? দুএকটা বল তো শুনি'?

'মনে নাই।'

'কিছুই মনে নাই? সে কে এটা কি বলেছে?'

'জ্বি-না।'

'ভাল করে ভেবে-টেবে বল তো — কোনকিছু কি মনে পড়ে?'

'উনার গায়ে শ্যাওলার মত গন্ধ ছিল।'

'আর কিছু?'

মন্তাজ মিয়া চুপ করে রইল।

আমি বললাম, ভাল করে ভেবে-টেবে বল তো। কিছুই মনে নেই'?

মন্তাজ মিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, একটা কথা মনে আসছে।

'সেটা কি?'

'বলতাম না। কথাডা গোপন।'

'বলবি না কেন?'

মন্তাজ জবাব দিল না।

আমি আবার বললাম — বল মন্তাজ, আমার খুব শুনতে ইচ্ছা করছে।

মন্তাজ ওঠে চলে গেল।

এই তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। বাকি যে কদিন গ্রামে ছিলাম সে কোনদিন আমার কাছে আসে নি। লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছি, তবু আসে নি। কয়েকবার নিজেই গেলাম। দূর থেকে দেখতে পেয়ে সে পালিয়ে গেল। আমি আর চেষ্টা করলাম না।

কিছু রহস্য সে তার নিজের কাছে রাখতে চায়। রাখুক। এটা তার অধিকার। এই অধিকার অনেক কষ্টে সে অর্জন করেছে। শ্যাওলা-গন্ধী সেই ছায়াসঙ্গীর কথা আমরা যদি কিছু নাও জানি তাতেও কিছু যাবে না আসবে না।



শবযাত্রা

পুরোপুরি নাস্তিক মানুষের সংখ্যা এই পৃথিবীতে খুবই কম। ঘোর নাস্তিক যে মানুষ তাকেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খুব দুর্বল দেখা যায়। আমি একজন ঘোর নাস্তিককে চিনতাম, তার ঠোঁটে একবার একটা গ্রোথের মত হল। ডাক্তাররা সন্দেহ করলেন — ক্যানসার। সঙ্গে সঙ্গে সেই নাস্তিক পুরোপুরি আস্তিক হয়ে গেলেন। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার জন্যে মসজিদে যান। মালিবাগের পীর সাহেবের মুরীদও হলেন।

বায়োপসির পর ধরা পড়ল যে গ্রোথের ধরণ খারাপ নয়। লোকালাইজড গ্রোথ। ভয়ের কিছুই নেই। অপারেশন করে ফেলে দিলেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আবার নাস্তিক হয়ে পড়লেন। ভয়াবহ ধরনের নাস্তিক। অংক করে প্রমাণ করে দিলেন যে, ঈশ্বর = $০^২$ ও এবং আত্মা = $০^১$।

যাই হোক, মানুষদের চরিত্রের এই দ্বৈত ভাব আমাকে বিস্মিত করে না। প্রচণ্ড রকম ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষের মধ্যেও আমি অবিশ্বাসের বীজ দেখেছি। আমার কাছে এটাই স্বাভাবিক মনে হয়। এর বাইরে কিছু দেখা মানে অস্বাভাবিক কিছু দেখা।

আমি এরকম একজন অস্বাভাবিক চরিত্রের কথা এই গল্পে বলব। চরিত্রের নাম মোতালেব (কাল্পনিক নাম)। বয়স পঞ্চাশ থেকে পাঁচপঞ্চাশ। ভীষণ রোগা এবং প্রায় তালগাছের মত লম্বা একজন মানুষ। চেইন স্মোকার। মাথায় কিছু অসুবিধা আছে বলেও মনে হয়। নিতান্ত অপরিচিত লোককেও এই ভদ্রলোক শীতল গলায় বলে ফেলতে পারেন — ভাই কিছু মনে করবেন না, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি একজন মহামূর্খ।

মোতালেব সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় এক বিয়ে বাড়িতে। সেদিন ঐ বিয়েবাড়িতে কি একটা সমস্যা হয়েছে, কাজী পাওয়া যাচ্ছে না কিংবা এই জাতীয় কিছু।

বরপক্ষীয় এবং কনেপক্ষীয় লোকজন বিমর্ষ মুখে ছোট ছোট-গ্রুপে ভাগ হয়ে গল্প করছে। আমি একটা দলের সঙ্গে জুটে গেলাম। সেখানে জনৈক অধ্যাপক বিগ বেং এবং এক্সপানডিং ইউনিভার্স সম্পর্কে কথা বলছেন। শ্রোতারা চোখ বড় বড় করে শুনছে।

ভদ্রলোক ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে কথা বলা শুরু করেছেন, তখন একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটল। রোগা এবং লম্বা একজন শুকনো মানুষ বললেন, ভাই কিছু মনে করবেন না, আপনি একজন মহামূর্খ।

অধ্যাপক ভদ্রলোক নিজেকে সামলাতে কিছু সময় নিলেন। পুরোপুরি সামলাতে পারলেন না — কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, আপনি কি আমাকে মহামূর্খ বললেন?

'জ্বি।'

'কেন বললেন জানতে পারি?'

'অবশ্যই জানতে পারেন। আপনি আপনার বক্তৃতা শুরুই করেছেন ভুল তথ্য দিয়ে — বলছেন ব্যাক গ্রাউণ্ড রেডিয়েশন ধরা পড়েছে ইনফ্রারেডে। তা পড়ে নি। ধরা পড়েছে মাইক্রোওয়েভে। আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি'র একটি স্বীকার্যই হচ্ছে স্পেস এবং টাইমের জন্ম বিগ বেং সিংগুলারিটিতে। আপনি বললেন ভিন্ন কথা। কোন কিছুই না জেনে একটার সঙ্গে একটা মিলিয়ে কি সব উল্টাপাল্টা কথা বলছেন।'

অধ্যাপক ভদ্রলোক রাগে তোতলাতে তোতলাতে বললেন —

'আমি তো ইউনির্ভাসিটিতে ক্লাস নিচ্ছি না . . . একটু এদিক-ওদিক হতেই পারে।'

'বিজ্ঞান ঠাকুরমার ঝুলি না যে যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে বলবেন।'

ভদ্রলোক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে অন্যদিকে সরে গেলেন। আমি গেলাম তাঁর পেছনে পেছনে। মজার চরিত্র। কথা বলা দরকার।

যতটুকু মজার চরিত্র ভেবে ভদ্রলোকের কাছে গেলাম, দেখা গেল, চরিত্র তার চেয়েও মজার। ভদ্রলোকের বিষয় পদার্থবিদ্যা নয় — সাইকোলজি। পদার্থবিদ্যা হচ্ছে তাঁর শখ। এই শখ মেটানোর জন্যে রীতিমত শিক্ষক রেখে অংক, পদার্থবিদ্যা শিখেছেন।

এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে সহজে বন্ধুত্ব হয় না। আমি লক্ষ্য করেছি, এরা সচরাচর সন্দেহবাতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। এই লোকও দেখা গেল সেই রকম। একদিন বেশ বিরক্ত হয়েই বলল, আপনি দেখি মাঝে মাঝেই আমার কাছে আসেন। বিষয়টা কি বলেন তো?

'বিষয় কিছু না।'

'বিষয় কিছু না বললে তো হবে না। এ পৃথিবীতে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই হয় না।'

আমি হাসি মুখে বললাম,

'ক্লাসিক্যাল ম্যাকানিক্স, তাই বলে কিন্তু ভাই মোতালেব সাহেব, হাইজেনবার্গের আনসারটিনিটি প্রিন্সিপ্যাল আপনি ভুলে যাচ্ছেন। একটি বস্তুকে পুরোপুরি আপনি কিন্তু জানেন না। যখন অবস্থান জানেন তখন সঠিক গতি কি তা জানেন না . . .।'

'আপনার সঙ্গে কূটতর্কে যেতে যাচ্ছি না — আপনি স্পষ্ট করে বলুন কি জন্যে আমার কাছে আসেন — মদ্যপানের লোভে?'

আমি ঝামেলা এড়াবার জন্যে বললাম, হ্যাঁ।

'ভাল কথা। আমার পেছনে অনেকেই ঘুরে এবং তাদের উদ্দেশ্য একটাই — বিনা পয়সায়, মদ্যপান। তৃষ্ণার্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি মধ্যপান করতে চায়, তবে তা নিজের

বাসায় নয়, অন্যের বাসায় — যাতে স্ত্রী জানতে না পারে। নিজের পয়সায় না অন্যের পয়সায়, যাতে টাকা-পয়সা খরচ না হয় — অদ্ভুত মধ্যবিত্ত।'

আমি বললাম, আপনি মনে হচ্ছে মধ্যবিত্তদের উপর খুব বিরক্ত।

'অফকোর্স বিরক্ত। মধ্যবিত্ত হচ্ছে সমাজের একটা ফাজিল অংশ। আনকনট্রোলড গ্রোথ। এই মধ্যবিত্তের প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা হয়ে কাজিনের কাছে, প্রথম যৌনতার অভিজ্ঞতা হয় বাড়ির কাজের মেয়ের সঙ্গে। প্রথম মদ্যপানের অভিজ্ঞতা হয় অন্যের পয়সায়। এখন বলুন আপনাকে কি দেব? স্কচ ক্লাব আছে, জীন আছে, ভদকা আছে, কয়েক পদের হুইস্কি আছে। আর আপনার যদি মিক্সড ড্রিংক পছন্দ হয় তাহলে তাও বানিয়ে দেব। Your name it, I will make it- হা — হা হা।'

'কিছু মনে করবেন না ভাই। আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম — বিনা পয়সায় মদের লোভে না, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার লোভেই আমি আসি।'

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, আমাকে কি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার বলে মনে হয়?

'হ্যাঁ।'

'আমি এই নিয়ে তিনবার বিয়ে করেছি — কোন স্ত্রী আমাকে ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার বলে মনে করে নি। প্রথমজন অনেক কষ্টে দু'বছরের মত টিকে ছিল, বাকি দু'জন এক বছরও টিকে নি। হা হা হা।'

'না টেকায় আপনি মনে হচ্ছে খুশিই হয়েছেন।'

'হ্যাঁ হয়েছি। স্ত্রীরা স্বামীদের স্বাধীনতায় হাত দিতে পছন্দ করে। শুধু শুধু নানান বায়নাক্কা — মদ খেতে পারবে না, রাত জেগে পড়তে পারবে না, জুয়া খেলতে পারবে না — আরে কি মুশকিল, আমার সব কথায় কথা বল কেন? আমি কি তোমার কোন ব্যাপারে মাথা গলাই? আমি কি বলি — নীল শাড়ি পরতে পারবে না, লাল শাড়ি পরতে হবে। হাই হিল পরতে পারবে না, ফ্ল্যাট স্যাণ্ডেল পরবে। বলি কখনো? না, বলি না। আমি ওদেরকে ওদের মত থাকতে বলি। আমি নিজে থাকতে চাই আমার মত। ওরা তা দেবে না।'

'এই যে এখন একা-একা বাস করছেন, আপনি কি মনে করেন আপনি সুখী?'

'হ্যাঁ সুখী, মাঝে মাঝে একটু দুঃখ ভাব চলে আসে, তখন মদ্যপান করি। প্রচুর পরিমাণেই করি। পুরোপুরি মাতাল হতে চেষ্টা করি। পারি না। শরীর যখন আর এলকোহল একসেপ্ট করতে পারে না তখন বমি করে ফেলে দেয় কিন্তু মাতাল হতে দেয় না — কেন দেয় না তারও একটা কারণ আছে।'

'কি কারণ?'

'বলব, আরেকদিন বলব। এখন বলেন কি খাবেন? আজকের আবহাওয়াটা 'ব্লাডি মেরির' জন্যে খুব আইডিয়াল। দেব একটা ব্লাডি মেরি বানিয়ে? জিনিসটা স্বাস্থ্যের জন্যেও ভাল। প্রচুর টমেটোর রস দেয়া হয়।'

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ভালই খাতির হল। মাসে দু'একবার তাঁর কাছে যাই। বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে কথা হয়। যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, এন্টি-ম্যাটার, লাইফ আফটার ডেথ। ভদ্রলোকের নাস্তিকতা দেখার মত, যা বলবেন — বলবেন। কোথাও সংশয়ের কিছু রাখবেন না। আমার মত আরো অনেকেই আসে। তবে তাদের মূল আগ্রহ

জলযাত্রায়।

একবার আমাদের আড্ডায় এক ভদ্রলোক একটি ব্যক্তিগত ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এ রকম — শ্রাবণ মাসে একবার তিনি গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন। বাড়ি স্টেশন থেকে অনেকখানি দূর। সন্ধ্যাবেলা ট্রেন এসে পৌঁছার কথা। পৌঁছতে পৌঁছতে রাত ন'টা বেজে গেল। গ্রামদেশে রাত ন'টা মানে নিশুতি রাত। ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। স্টেশনে একটা লোক নেই। একা-একাই রওনা হলাম। কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ দেখি, আমার আগে আগে কে যেন সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ কাউকে দেখি নি। এখন এই সাইকেলে করে কে যাচ্ছে? আমি বললাম — কে কে কে? কেউ জবাব দিল না। লোকটা একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে চিনলাম। যে সাইকেলে বসে আছে তার নাম পরমেশ। আমরা এক সঙ্গে স্কুলে পড়েছি। বছর তিনেক আগে নিউমোনিয়া হয়ে মারা যায় . . . .

গল্পের এই পর্যায়ে মোতালেব সাহেব বাঁজখাই গলায় বললেন — স্পট। আপনি বলতে চাচ্ছেন — আপনার এক মৃতবন্ধু সাইকেল চালিয়ে আপনার পাশে পাশে যাচ্ছিল'?

'হ্যাঁ।'

'মনে হচ্ছে আপনাকে সাহস দেবার জন্যেই সে আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল।'

'হতে পারে।'

মোতালেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নিলাম যে, আপনার বন্ধু মরে ভূত হয়েছেন। আপনাকে সাহস দেবার জন্যে আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন। এখন সমস্যা হল — সাইকেল। একটা সাইকেল মরে 'সাইকেল-ভূত' হবে না, যদি না হয় তাহলে আপনার ভূত-বন্ধু সাইকেল পেল কোথায়?

যিনি গল্প করছিলেন তিনি থমকে গেলেন। মোতালেব সাহেব বললেন, স্বীকার করলাম অবশ্যই তর্কের খাতিরে যে মানুষ মরে ভূত হতে পারে তাই বলে কাপড় মরে তো 'কাপড়-ভূত' হবে না। আমরা যদি ভূত দেখি তাদের নেংটা দেখা উচিত। ওরা কাপড় পায় কোথায়? সব সময় দেখা যায় ভূত একটা সাদা কাপড় পরে থাকে। এর মানে কি?

মজার ব্যাপার হচ্ছে — এই ঘোর নাস্তিক, প্রচণ্ড যুক্তিবাদী মানুষের কাছ থেকে আমি অবিশ্বাস্য একটি গল্প শুনি। যেভাবে গল্পটি শুনেছিলাম অবিকল সেইভাবে বলছি। গল্পের শেষে মোতালেব সাহেব কিছু ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অপ্রয়োজনীয় বিধায় সেই ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি না। বৈশাখ মাসের এক ঝড়বৃষ্টির সন্ধ্যায় মোতালেব সাহেব গল্প শুরু করলেন।

'এই যে ভাই লেখক, ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতার একটা ঘটনা শুনবেন? একটা কণ্ডিশনে ঘটনাটা বলতে পারি। চুপ করে শুনে যাবেন কোন প্রশ্ন করতে পারবেন না। এবং ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারবেন না।'

'বিশ্বাস করলে অসুবিধা কি?'

'অসুবিধা আছে। আমার মাধ্যমে কোন অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার প্রচার পাবে তা হয় না। তা হতে দেয়া যায় না। আপনি যদি ধরে নেন, এখন যা শুনছেন তা একটা গল্প,

মজার গল্প, তা হলেই আপনাকে বলতে পারি।'

'এ গল্পটি আমি কোথাও ব্যবহার করতে পারি?'

'পারেন। কারণ গল্প-উপন্যাসকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। সবাই ধরেই নেয় এগুলো বানানো ব্যাপার।'

'তাহলে বলুন, শুনি।'

ভদ্রলোক পরপর চার পেগ মদ্যপান করলেন। তাঁর মদ্যপানের ভঙ্গিও অদ্ভুত। ওষুধের মেজারিং গ্লাস ভর্তি করে হুইস্কি নেন। এক ফোঁটাও পানি মেশান না। ঢক করে পুরোটা মুখে ফেলে দেন কিন্তু গিলে ফেলেন না। কুলকুচা করার মত শব্দ হয়, তারপর এক সময় ঘোঁৎ করে গিলে ফেলে বলেন — কেন যে মানুষ এই ছাইপাশ খায়, বলেই আবার খানিকটা নেন। যাইহোক, ভদ্রলোকের জবানিতে মূল গল্পে যাচ্ছি —

'তখন আমার বয়স চব্বিশ। এম. এ. পাস করেছি। ধারণা ছিল খুব ভাল রেজাল্ট হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচার হিসেবে এন্ট্রি পেয়ে যাব। তা হয় নি। এম. এম.'র রেজাল্ট খুবই খারাপ হল। কেন হল তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। পরীক্ষা ভাল দিয়েছি। একটা গুজব শুনতে পাচ্ছি — জনৈক অধ্যাপক রাগ করে আমাকে খুবই কম নম্বর দিয়েছেন। এই গুজব অমূলক নাও হতে পারে। অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল না। দু-একজন আমাকে বেশ পছন্দ করেন, আবার কেউ কেউ আছেন আমার ছায়াও সহ্য করতে পারেন না।

যা বলছিলাম, রেজাল্টের পর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাবা খুব রাগারাগি করলেন। হিন্দী ভাষায় বললেন — নিকালো। আভি নিকালো।

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, চলে যাচ্ছি। হিন্দী বলার দরকার নেই।

এই বলেই স্যুটকেস গুছিয়ে বের হয়ে পড়লাম। আমি খুবই স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে। কাজেই খালি হাতে ঘর থেকে বের হলাম না। বেশ কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে বের হলাম। কোথায় যাচ্ছি কাউকে বলে গেলাম না। সঙ্গে একগাদা বই, বিশাল একটা খাতা। একডজন বল পয়েন্ট। সেই সময় আমার লেখালেখির বাতিক ছিল। একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস শুরু করেছিলাম। যে উপন্যাস মূল ডিটেকটিভ খুন করে। ইন্টারেস্টিং গল্প।

যাই হোক, বাড়ি থেকে বের হয়েও খুব একটা দূরে গেলাম না। একটা হোটেল ঘর ভাড়া করে রইলাম। দেখি সেখানে কাজ করার খুব অসুবিধা — সারাক্ষণ হৈচৈ। কিছু কিছু কামরায় রাত-দুপুরে মদ খেয়ে মাতলামিও করে। মেয়েছেলে নিয়ে আসে।

হোটেল ছেড়ে দিয়ে শহরতলীতে একটা বেশ বড় বাড়ি ভাড়া করে বসলাম। এক জজ সাহেব শখ করে বাড়ি বানিয়েছিলেন। তাঁর শখ হয়তো এখনো আছে, ছেলেমেয়েদের শখ মিশে গেছে। এ বাড়িতে কেউ আর থাকতে আসে না।

একজন কেয়ারটেকার-কাম মালি-কাম দারোয়ান আছে। বাড়ির পুরো দায়িত্ব তার। লোকটিকে দেখেই মনে হয় ভদ্রলোক। আমাকে যে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে, মনে হচ্ছে নিজ দায়িত্বেই দিয়েছে। ভাড়ার টাকা মালিকের কাছে পৌঁছাবে বলে মনে হল না। ওটা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। পৌঁছলে পৌঁছবে, না পৌঁছলে নেই। আমার এক মাস থাকার কথা, সেটা থাকতে পারলেই হল। নিরিবিলি বাড়ি, আমার খুবই পছন্দ হল।

লেখালেখির জন্যে চমৎকার।

কেয়ারটেকারের নাম ইয়াকুব। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছে। রিপালসিভ ধরনের চেহারা তবে গলার স্বরটি অতি মধুর। আমি একাই এ বাড়িতে থাকব শুনে সে বিস্মিত গলায় বলল, স্যার কি সত্যি সত্যি একা থাকবেন?

'হ্যাঁ।'

'বিষয়টা কি?'

'বিষয় কিছু না। পড়াশোনা করব। লেখালেখি করব।'

'আর খাওয়া-দাওয়া? হোটেল এইখানে পাবেন কোথায়? সেই যদি শহরে যান। পাঁচ মাইলের ধাক্কা।'

'রান্না করে দেবে এমন কাউকে পাওয়া যায় না? টাকা-পয়সা দেব।'

'আপনি বললে আমি রাঁধব। খেতে পারবেন কি-না সেটা হল কথা।'

'পারব। খাওয়া নিয়ে আমার কোন খুঁতখুঁতানি নেই।'

'আরেকটা জিনিস বলে রাখি স্যার। মুরগি ছাড়া কিন্তু কিছু পাওয়া যায় না। হাটবার মাছ-টাছ পাওয়া যায়। হাটবারের দেরি আছে। আর চালটা স্যার একটু মোটা আছে। আপনার নিশ্চয়ই চিকন চাল খেয়ে অভ্যাস?'

'চিকন চাল খেয়ে অভ্যাস ঠিকই, মোটা চালে অসুবিধা হবে না। তবে ভাত যেন শক্ত না হয়। শক্ত ভাত খেতে পারি না।'

দেখা গেল লোকটি রান্নায় দ্রৌপদী না হলেও তার কাছাকাছি। দুপুরে খুব ভাল খাওয়াল। রাতেও নতুন নতুন পদ করল। আমি বিস্মিত। রাতে খেতে খেতে বললাম, এত ভাল রান্না শিখলে কোথায়? ইয়াকুব গম্ভীর মুখে বলল,

'আমার স্ত্রীর কাছে শিখেছি। খুব ভাল রাঁধতে পারত।'

'পারত বলছ কেন? এখন কি পারে না?'

ইয়াকুব গম্ভীর হয়ে গেল। ভাবলাম, নিশ্চয়ই খুব ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার। এখন আর প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না। তবে সহজেই নিজেকে সামলে নিল। সহজ স্বরে বলল, এখন পারে কি পারে না জানি না স্যার। আমার সঙ্গে থাকে না।

'কোথায় থাকে?'

'জানি না কোথায় থাকে। ওর চরিত্র খারাপ ছিল। এর-তার সাথে যোগাযোগ ছিল। বিশ্রী অবস্থা। বলার মত না। অনেক দেন-দরবার করেছি কিন্তু লাভ হয় নাই। তারপর সাত বছরের দুই মেয়ে ঘরে রেখে পালিয়ে গেছে, বুঝে, দেখেন কত বড় হারামী।'

'কতদিন আগের কথা?'

'বছর দুই।'

'কোন খবর পাওয়া যায় নি?'

'মোড়লগঞ্জ বাজারে না-কি দেখা গিয়েছিল — আমার কোন আগ্রহ ছিল না। খোঁজ নেই নাই।'

এদের জীবনের এই জাতীয় কিচ্ছা-কাহিনী শুনতে সাধারণত ভালই লাগে। আমার লাগল না। আমাদের সবার জীবনেই একান্ত সমস্যা আছে। সেই সব নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। কিন্তু ইয়াকুব মনে হল কথা বলবেই।

'জীবনে বড় ভুল কি করেছিলাম জানেন স্যার? সুন্দরী বিয়ে করেছিলাম। ডানাকাটা পরী বিয়ে করেছিলাম।'

'বউ খুব সুন্দরী ছিল?'

'আগুনের মত ছিল। আগুন থাকলেই পোকামাকড় আসে। তাই হল। আমার জীবন হল অতীষ্ঠ। একদিন মোড়লগঞ্জের বাজারে গেছি, ফিরে এসে দেখি সদর দরজা বন্ধ। অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করলাম, কেউ দরজা খোলে না। শেষে ধুপ করে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে কে যেন দৌড় দিল। আমি বউরে বললাম — এ কে? বউ বলল, আমি কি জানি কে?"

ইয়াকুব একের পর এক বউয়ের কীর্তিকাহিনী বলতে লাগল, আমি এক সময় বিরক্ত হয়ে বললাম,

'ঠিক আছে, বাদ দাও এসব কথা।'

'বাদ দিতে চাইলেও বাদ দেয়া যায় না। তিনবার সালিশী বসল। সালিশীতে ঠিক হল বউরে তালাক দিতে হবে। তালাক দিলাম না। মন মানল না। তার উপর জমজ মেয়ে আছে। এর ফল হল এই.....'

'স্ত্রী কোথায় আছে তুমি জান না?'

'জ্বি-না।'

'মেয়েরা তোমার সঙ্গেই থাকে?'

'জ্বি'।

'কি নাম মেয়েদের?'

'জমজ মেয়ে হয়েছিল জনাব। তুহিন একজনের নাম, তুষার আরেকজনের নাম। নাম রেখেছিল মেয়ের মা।'

'ভাল, খুব ভাল।'

'কোন কিছু দরকার লাগলে এদের বলবেন। মেয়েরা এখানেই থাকে, ডাক দিলেই আসবে।'

'না, আমার কিছু লাগবে না।'

'বিরক্ত করলেও বলবেন। থাবড়া দিয়ে গাল ফাটায়ে দিব। মেয়েগুলি বেশি সুবিধার হয় নাই। মায়ের খাসিলত পেয়েছে। সারাদিন সাজগোজ। এই পায়ে আলতা, এই ঠোঁটে লিপস্টিক।

'স্কুলে পড়ে না?'

'আরে দূর — পড়াশোনা! এরা যায় আর আসে।'

মেয়ে দু'টিকে আমার অবশ্যি খুবই পচ্ছন্দ হল। দুজনই হাস্যমুখ। সারাক্ষণ হাসছে। সব সময় সেজেগুজে আছে। কাজেরও খুব উৎসাহ। যদি বলি, এই, এক গ্লাস পানি দাও তো। ওম্নি ছুটে যাবে। দুজনই দুহাতে দুটা পানি ভর্তি গ্লাস নিয়ে এসে বলবে, চাচা, আমারটা নেন। চাচা, আমারটা নেন। আধগ্লাস পানি খেলেই যেখানে চলত সেখানে বাধ্য হয়ে দুগ্লাস খাই। যাতে মেয়ে দুটোর কোনটাই কষ্ট না পায়।

স্নেহ নিম্নগামী। যত দিন যেতে লাগল বাচ্চা দুটিকে আমার ততই পছন্দ হতে লাগল। ছোটখাট কিছু উপহার কিনে দিলাম। দুজনের জন্যে দুটা রঙ-পেনসিলের

সেট, ছোট ছোট আয়না। যাই পায় আনন্দে লাফায়। বড় ভাল লাগে দেখতে। ঐ বাড়িতে দেখতে দেখতে এগারো দিন কেটে গেল। বার দিনের দিন একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনাটা বলার আগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটা বর্ণনা দিয়ে নেই।

আমার বাড়িটা পশ্চিমমুখী। বাড়ির সামনে এবং পেছনে আমন ধানের মাঠ। বাড়ির ওপরে জঙ্গলা ধরনের জায়গা। এক সময় নিবিড় বাঁশবন ছিল, এখন পাতলা হয়ে গেছে। দক্ষিণে উকিল বাড়ির বিশাল বাগান। সেই বাগানে আম, জাম, লিচু থেকে শুরু করে আতাফলের গাছ পর্যন্ত আছে। একজন বেঁটেখাট দাড়িওয়ালা মালি সেই বাগান পাহারা দেয়। আমার সঙ্গে দেখা হলেই গভীর বিনয়ের সঙ্গে জানতে চায়' — স্যারের শইলডা কি ভাল? ঘুমের কোন ডিসটার্ব হয় না তো?

আমি প্রতিবারই বিস্মিত হয়ে বলি, ঘুমের ডিসটার্ব হবে কেন?

'শহরের মানুষ হঠাৎ গেরামে আইস্যা পড়লেন। এই জন্যে জিগাই।'

'আমার ঘুম, খাওয়া-দাওয়া কোন কিছুতেই কোন অসুবিধা হচ্ছে না।'

'অসুবিধা হইলে কইবেন। ভয়-ডর পাইলে ডাক দিবেন, আমার নাম বদরুল, আমি রাইতে ঘুমাই না, জাগান থাকি।'

'ঠিক আছে বদরুল। যদি কখনো প্রয়োজন বোধ করি তোমাকে ডাকব।'

এগারো দিনের দিন প্রয়োজন বোধ করলাম। দিনটা সোমবার। সকাল থেকেই মেঘলা ছিল। দুপুর থেকে তুমুল বর্ষণ শুরু হল। এর মধ্যে ইয়াকুব এসে বলল, স্যার, একটা বিরাট সমস্য। তুহীনের গলা ফুলে কি যেন হয়েছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।

ওকে তো স্যার ডাক্তারের কাছে নেয়া দরকার।

আমি তৎক্ষণাৎ মেয়েটাকে দেখতে গেলাম। খুবই খারাপ অবস্থা। শুধু গলা না-সমস্ত মুখ ফুলে গেছে। কি কষ্টে যে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে-ই জানে। মেয়েটার শরীর এত খারাপ অথচ এরা আমাকে কিছুই বলে নি। আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

আমি বললাম, এক মুহূর্ত দেরি করা ঠিক হবে না। তুমি এক্ষুনি মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।

'স্যার, আপনার খাওয়া-দাওয়া?'

'আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে ন। চাল ফুটিয়ে নিতে পারব। একটা ডিমও ভেজে নেব। তুমি দেরি করবে না।'

আমি ইয়াকুবকে কিছু টাকাও দিলাম। সে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দুই মেয়েকে একটা গরুর গাড়িতে তুলে রওনা হয়ে গেল। আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কেন যে মনে হল মেয়েটা বাঁচবে না।

আমি থাকি দোতলার দক্ষিণমুখী একটা ঘরে। ঘরটা বিশাল। দুদিকে জানালা আছে। আসবাবপত্র বলতে পুরানো একটা খাট, খাটের পাশে লেখার টেবিল। লেখার টেবিলে হারিকেন ছাড়াও মোমদানে মোমবাতি। লেখালেখির জন্যে শুধু হারিকেনের আলো যথেষ্ট নয় বলেই মোমবাতির ব্যবস্থা।

কেন জানি সন্ধ্যার পর থেকে ভয় ভয় করতে লাগল। বিছানায় বসে লিখছি, হঠাৎ মনে হল, কেউ-একজন দক্ষিণের বারান্দায় নরম পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমি ' কে কে' বলতেই হাঁটার শব্দ থেমে গেল।

আমি দুর্বল চিত্তের মানুষ নই। তবে যে কোন সাহসী মানুষও কোন কারণে বিশাল একটা বাড়িতে একা পড়ে গেলে একটু অন্য রকম বোধ করে। আমার কেমন অন্য রকম লাগতে লাগল। সেই অন্য রকমটাও আমি ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারছিলাম না। একবার মনে হচ্ছে পানির পিপাসা হচ্ছে, আবার পর মুহূর্তেই মনে হচ্ছে — না, পানির পিপাসা না- অন্য কিছু। অনেক চেষ্টা করেও লিখতে পারলাম না। লেখার জন্যে মাথা নিচু করতেই মনে হয় দরজার ফাঁক দিয়ে কেউ আমাকে দেখছে। তাকালেই সরে যাচ্ছে। দুবার আমি বললাম — কে, কে? বলেই লজ্জা পেলাম। কে কে বলে চেঁচানোর কোন মানে হয় না।

এই সময় লক্ষ্য করলাম, হারিকেনের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তেল কমে এসেছে। এক্ষুনি হয়ত দপ করে নিভে যাবে। সবুজ রঙের বড় একটা বোতলে কেরোসিন তেল থাকে। সেই বোতলটি একতলায় রান্নাঘরে। তাছাড়া মোমবাতি তো আছেই।

আমি নিভুনিভু হারিকেন নিয়ে একতলায় নেমে গেলাম। চা বানিয়ে খাব। হারিকেনে তেল ভরব। রাতে খাবার কিছু করা যায় কি-না তাও দেখব।

দেখলাম, রাতে খাবার জন্যে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। ইয়াকুব ভাত রেঁধে রেখে গেছে। কড়াইয়ে ডাল আছে। ডিম আছে। ইচ্ছা করলেই ডিম ভেজে নেয়া যায়। চা বানিয়ে খেলাম। ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা নিয়ে দোতলায় ওঠে এলাম। বারান্দায় পা দিতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মনে হল, সবুজ রঙের ডোরে শাড়ি পরা একটি মেয়ে যেন হঠাৎ দ্রুত সরে গেল। মেয়েটার চোখ দুটি মায়া মায়া। কিন্তু এই অন্ধকারে মেয়েটার চোখ দেখার কথা না। তাহলে আমি এসব কি দেখছি?

বৃষ্টির বেগ খুব বাড়ছে। রীতিমত ঝড়ো হাওয়া বইছে। আমি আমার ঘরে আগের জায়গায় ফিরে এলাম। জানালা বন্ধ করে দিলাম। শোঁ-শোঁ শব্দ তবু কমল না। ঠিক তখন বজ্রপাত হল। প্রচন্ড বজ্রপাত। সাউন্ড ওয়েভের নিজস্ব একটা ধাক্কা আছে। এই ধাক্কায় মোমবাতির কিংবা হারিকেনের শিখা নিভে যায়। টেবিলের উপর হারিকেনের আলো নিভে গেল। হঠাৎ চারদিক গাঢ় অন্ধকার।

আমি তখন পরিষ্কার শুনলাম, মেয়েলী গলায় কেউ একজন বলছে — আপনে বইরে আসেন। আমি চেঁচিয়ে বললাম — কে? সেই আগের কণ্ঠ আবার শোনা গেল — ভয় পাইয়েন না। একটু বাইরে আইসা দাঁড়ান।

অল্পবয়স্ক মেয়ে মানুষের গলা। পরিষ্কার গলা।

আমি আবার বললাম — কে, তুমি কে?

কোন জবাব পাওয়া গেল না। মনে হল কেউ যেন ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। ঘরের দরজা একটু ফাঁক করল।

আমি ওঠে বারান্দায় চলে এলাম। বারান্দায় কেউ নেই। তবু মনে হল কেউ একজন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে চাচ্ছে কিছুটা সময় আমি বারান্দায় থাকি।

ধুপধুপ শব্দ আসছে। শব্দ কোত্থেকে আসছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোদাল দিয়ে কেউ মাটি কোপাচ্ছে। এই ঝড়বৃষ্টির রাতে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে কে? আমি বারান্দার রেলিং-এর দিকে এগিয়ে গেলাম, তখন বিদ্যুৎ চমকালো।

বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, দক্ষিণ দিকের বাঁশবনের কাছে কোদাল দিয়ে একজন মাটি কোপাচ্ছে। যে মাটি কোপাচ্ছে সে হল আমাদের ইয়াকুব।

কিন্তু ইয়াকুব এখনে আসবে কেন? ও-তো মেয়ে নিয়ে শহরে গেছে। বিদ্যুচ্চমক দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। এককেবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর আমি তাকে দেখছি। সে খুব ব্যস্ত হয়ে মাটি কোপাচ্ছে। গভীর গর্ত করছে। সে কি কবর খুদছে? পাশে কাপড় দিয়ে মোড়া লম্বা এটা কি?

পরিষ্কার কিছু দেখছি না। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তখনই শুধু দেখছি। বুঝতে পারছি এটা বাস্তব কোন দৃশ্য নয়। এই দৃশ্যের জন্ম আমার চেনা-জানা জগতে নয়। অন্য জগতে, অন্য সময়ে।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছি। মুষলধারে বর্ষণ হচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আমি ইয়াকুবকে দেখছি। সে অতি ব্যস্ত। অতি দ্রুত কবর খুদছে। কার কবর? সবুজ কাপড়ে মোড়া একটি মৃতদেহ পাশেই রাখা। বৃষ্টির পানিতে তা ভিজছে। এটা কি তার স্ত্রীর মৃতদেহ? কি আশ্চর্য, হাত পাঁচেক দূরে বাচ্চা দুটা বসে আছে। এরা এক দৃষ্টিতে মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে আছে।

যে রূপবতী স্ত্রী পালিয়ে যাবার কথা ইয়াকুব বলে, এই কি সেই মেয়ে? এই মেয়েটিকে সে-ই কি হত্যা করেছিল? হত্যাকাণ্ডটি কোন-এক বর্ষার রাতে ঘটেছিল? কোন-এক অস্বাভাবিক উপায়ে সেই মুহূর্তটি কি আবার ফিরে এসেছে — আমি দেখছি? ইন্দ্রিয়ের অতীত কোন একটি দৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ধরা পড়ছে আমার কাছে।

আমি আমার এই জীবনে কোন অতিপ্রাকৃতিক বিষয়কে স্থান দেই নি। আজ আমি এটা কি দেখছি?

ভদ্রলোক এইখানে গল্প শেষ করলেন।

আমি বললাম — তারপর? তরপর কি হল?

তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনাকে একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাচ্ছিলাম, বলা হল। এর আর তারপর বলে কিছু নেই।

'আপনি এই দৃশ্যটি দেখলেন, তারপর কি করলেন?'

'আপনি হলে কি করতেন?'

'আমি হলে কি করতাম সেটা বাদ দিন। আপনি কি করেছেন সেটা বলুন'

'দাঁড়ান, আরো খানিটা এলকোহল গলায় ঢেলে নেই। তা না হলে বলতে পারব না।'

ভদ্রলোক ঢকঢক করে অনেকখানি কাঁচা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চোখ রক্তবর্ণ হয়ে গেল। তিনি স্থির গলায় বললেন — আমি সেদিন যা করেছিলাম একজন বুদ্ধিমান যুক্তিবাদী মানুষ তাই করবে — আমি ছুটে গিয়েছিলাম সেখানে। প্রচণ্ড ভয়াবহ কোন ঘটনার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে মানুষের ভয় থাকে না। এক জাতীয় এনজাইম শরীরে চলে আসে। তখন প্রচুর গ্লোকুজ ভাঙতে শুরু করে। মানুষ শারীরীয় শক্তি পায়। ভয় কেটে যায়।

'আমার কোন ভয় ছিল না। আমি দ্রুত গেলাম ঐ জায়গায়। কাদায়-পানিতে

মাখামাখি হয়ে গেলাম।'

'তারপর কি দেখলেন?'

'কি আর দেখব? কিছুই দেখলাম না। আপনি কি ভেবেছেন, গিয়ে দেখব ইয়াকুব তার স্ত্রীর ডেডবডি নিয়ে বসে আছে?'

'না তা ভাবি নি।'

'নেচার বলুন বা ঈশ্বর বলুন বা প্রকৃতি বলুন — এরা কোন রকম অস্বাভাবিকতা সহ্য করে না। এই জিনিসটি খেয়াল রাখবেন। কাজেই আমি কিছুই দেখলাম না। বৃষ্টিতে ভিজলাম, কাদায় মাখামাখি হলাম আমার জেদ চেপে গেল। পাশের বাগানের মালিকে ডেকে এনে সেই রাতেই জায়গাটা খুঁড়লাম কিছুই পাওয়া গেল না।

পরদিন থানায় খবর দিলাম। পুলিশের সাহায্যে আবারো খোঁড়াখুঁড়ি করা হল। কিছুই পাওয় গেল না। সবার ধারণা হল আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার বাবা খবর পেয়ে এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। দীর্ঘদিন ডাক্তারের চিকিৎসায় থেকে সুস্থ হলাম। শুনে অবাক হবেন, এই ঘটনার পর মাসখানিক আমি ঘুমুতে পারতাম না।

'গল্পটা কি এখানেই শেষ, না আরো কিছু বলবেন?'

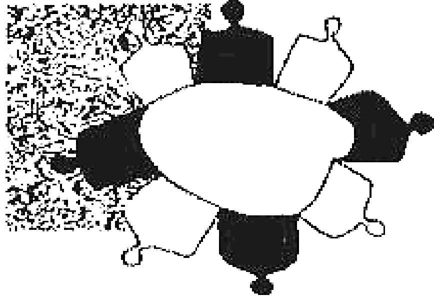
'না, আর কিছু বলব না। ভাই আগেই তো বলেছি এটা কোন ভৌতিক গল্প না। ভৌতিক গল্প হলে দেখা যেত, ইয়াকুব বৌটাকে মেরে ঐখানে কবর দিয়ে রেখেছিল। ভৌতিক গল্প না বলেই — ঐটা সত্যি হয় নি। তবে ঐ বাড়ি আমি কিনেনিয়েছি। বর্ষার সময় প্রায়ই ঐখানে একা-একা রাত্রিযাপন করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ রাতে ঘটনার অংশবিশেষ আমি দেখেছিলাম। নিজের উপর কনট্রোল হারিয়ে ফেলেছিলাম বলে বাকিটা দেখতে পারি নি। কোন একদিন বাকিটা হয়ত দেখব। ইচ্ছা করলে আপনিও আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আপনি কি যাবেন?

'না — আমার ভূত দেখার কোন ইচ্ছা নেই — আপনার ঐ মালি, ইয়াকুব নাকি যেন নাম বললেন, ও কি এখনো ঐ বাড়িতে আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'সে আপনার ঘটনা শুনে কি বলে?'

'এটাও একটা মজার ব্যাপার। সে কিছুই বলে না। হ্যাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। চুপ করে থাকে। ভাল কথা, এতক্ষণ যে আমাদের ড্রিংকস দিয়ে গেল, কাজু বাদাম দিয়ে গেল তার নামই ইয়াকুব। তাকে আমি সব সময় কাছাকাছি রাখি। আপনি কি তার সঙ্গে কথা বলবেন? ইয়াকুব, এই ইয়াকুব . . . .।



ওইজা বোর্ড

প্রায় আট বছর পর নাসরিনের বড় ভাই আলাউদ্দিন দেশে ফিরল। সঙ্গে বিদেশী বউ। বউয়ের নাম ক্লারা। বউয়ের চুল সোনালী, চোখ ঘন নীল, মুখটাও মায়া মায়া। তবু মেয়েটাকে কারোরই পছন্দ হল না।

যে পরিমাণ আগ্রহ নিয়ে নাসরিন বড় ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল, ভাইকে দেখে সে ঠিক ততখানি নিরাশ হল। আট বছর আগে নাসরিনের বয়স ছিল নয়, এখন সতেরো। নবছর বয়েসী চোখ এবং সতেরো বছর বয়েসী চোখ এক রকম নয়। ন' বছর বয়েসী চোখ সব কিছুই কৌতূহল এবং মমতা দিয়ে দেখে। সতেরো বছরের চোখ বিচার করতে চেষ্টা করে। তার বিচারে ভাইকে এবং ভাইয়ের বৌ-কে-দুজনকেই খারাপ লাগছে।

নাসরিন দেখল, তার ভাই আগের মত চুপচাপ শান্ত ধরনের ছেলে নয় — খুব হৈচৈ করা শিখেছে। স্ত্রীকে নিয়ে সবার সামনে বেশ আহলাদ করছে। ঠোঁট গোল করে 'হানি' ডাকছে। অথচ 'হানি' শব্দটা বলার সময় ঠোঁট গোল হয় না।

আলাউদ্দিন এতদিন পর দেশে এসেছে, আত্মীয়স্বজনদের জন্যে উপহার-টুপহার আনা উচিত ছিল, তেমন কিছুই আনে নি। ভুষভুষা অ্যাশ কালারের একটা স্যুয়েটার এনেছে মা'র জন্যে। সেই স্যুয়েটার নিয়ে কত রকম আদিখ্যেতা — পিওর ওল মা। পিওর ওল আজকাল আমেরিকাতেও এক্সপেনসিভ। মা, তোমার কি কালার পছন্দ হয়েছে?

নাসরিনের একবার বলার ইচ্ছা হল — অ্যাশ কালারে পছন্দের কি আছে ভাইয়া? অবশ্যি কিছু বলল না। তার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। এতদিন পর এসেছে, ভাইয়ার কি উচিত ছিল না মা'র জন্যে একটা ভাল কিছু আনা?

বাবার জন্যে এনেছে ক্যালকুলেটর। যে বাবা রিটায়ার করেছে, চোখে দেখতে পায় না, সে ক্যালকুলেটর দিয়ে কি করবে?

নাসরিনের বড় বোন শারমিন তার দুই জমজ মেয়েকে নিয়ে স্যুটকেস খোলার সময় বসে ছিল। এই দু'মেয়েকে আলাউদ্দিন দেখে নি। চিঠি লিখে জানিয়েছে, এই দু'মেয়ের

জন্যে একই রকম দুটা জিনিস নিয়ে আসবে যা দেখে দুজনই মুগ্ধ হবে। দুজনের জন্যে দুটা গায়ে মাখা সাবান বেরুল। এই সাবান ঢাকার নিউ মার্কেট ভর্তি — আমেরিকা থেকে বয়ে আনতে হয় না।

আলাউদ্দিন বলল, বেশি কিছু আনতে পারি নি, বুঝলি? লাস্ট মোমেন্টে ক্লারা ডিসাইড করল আমার সঙ্গে আসবে। অনেকগুলি টাকা বেরিয়ে গেল। কিছু টাকা সঙ্গেও রাখতে হয়েছে। ঢাকায় হোটেলের বিল কেমন কে জানে?

নাসরিন বলল, হোটেলের বিল মানে? তুমি কি হোটেলে উঠবে?

বাধ্য হয়ে উঠতে হবে। এই গাদাগাদি ভিড়ে ক্লারার দম বন্ধ হয়ে আসছে। চট করে তো সব অভ্যাস হয় না। আস্তে আস্তে হয়। তোরা আবার এটাকে কোন ইস্যু বানিয়ে বসবি না। তোদের কাজই তো হচ্ছে সামান্য ব্যাপারকে কোন মতে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ইস্যুতে নিয়ে যাওয়া।

নাসরিনের চোখে পানি এসে গেল। তার আপন বড় ভাই তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে সে স্বপ্নেও ভাবে নি। নাসরিনের চোখের পানি অবশ্যি কেউ দেখতে পেল না। একটু আসছি ভাইয়া বলেই সে চট করে ওঠে গেল। বাথরুমে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চোখ মুছে উপস্থিত হল। আলাউদ্দিন তখন স্যুটকেস খুলে আরো কি সব উপহার বের করছে। অতি তুচ্ছ সব জিনিস — গাড়ির পেছনে লাগানোর স্টিকার, যেখানে লেখা "Hug your kids". তাদের গাড়ি কোথায় যে তারা গাড়ির পেছনে স্টিকার লাগাবে? কেউ অবশ্যি কিছু বলল না। সবাই এমন ভাব করতে লাগল যে গাড়ির স্টিকারটার খুব প্রয়োজন ছিল।

আলাউদ্দিন বলল, নাসরিন, তোর জন্যে তো কিছু আনা হয় নি।

নাসরিন বলল, ভাইয়া, আমার কিছু লাগবে না।

'তোকে বরং এখান থেকেই শাড়ি-টাড়ি কিছু কিনে দেব।'

'আচ্ছা।'

আলাউদ্দিন স্যুটকেস ঘাঁটতে লাগল। তার ঘাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হয় সে আশা করছে কিছু একটা পেয়ে যাবে, যা নাসরিনকে দিতে পারলে শাড়ির ঝামেলায় যেতে হবে না। নাসরিনের লজ্জার সীমা রইল না।

'এই যে জিনিস পাওয়া গেছে।'

হাসিতে আলাউদ্দিনের মুখ ভরে গেল। সবাই ঝুঁকে পড়ল স্যুটকেসের উপর। লিপিস্টিকের মত একটা বস্তু বেরুল। আলাউদ্দিন বলল — নাসরিন নে। এর নাম লিপ গ্লাস। ঠোঁটে দিলে ঠোঁট চকচক করে, ঠোঁট ফাটে না।

নাসরিন শুকনো গলায় বলল, থ্যাংকস ভাইয়া।

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বলল,

'গিফট হচ্ছে গিফট। গিফটের মধ্যে সস্তা দামি কোন ব্যাপার না। বাঙালিদের স্বভাব হচ্ছে কোন উপহার পেলেই হিসাব-নিকাশে বসে যাবে। দাম কত কি!'

নাসরিন বলল, আমি কোন হিসাব করছি না ভাইয়া। লিপ গ্লাসটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

'দ্যাটস গুড। মাই গড — নাসরিন, তোর ভাগ্য ভাল, আরেকটা জিনিস পাওয়া

গেছে — ওইজা বোর্ড। এতক্ষণ চোখেই পড়ে নি।'

'ওইজা বোর্ড আবার কি?'

আলাউদ্দিন লুডু বোর্ডের মত একটা বোর্ড মেলে ধরল। চারদিকে এ থেকে জেড পর্যন্ত লেখা। মাঝখানে দু'টা ঘর — একটায় লেখ 'ইয়েস', একটায় 'নো'।

'এটা কি কোন খেলা ভাইয়া'?

'খেলাই বলতে পারিস। ভূত নামানোর খেলা। প্ল্যানচেটের নাম শুনিস নি? এটা দিয়ে প্ল্যানচেটের মত করা যায়।'

'লাল বোতামটা দেখছিস না? দুজন বা তিনজন মিলে খুব হলকাভাবে তর্জনী দিয়ে এটাকে টাচ করে রাখবি, কোন রকম প্রেসার দেয়া যাবে না। বোতামটাকে রাখবি বোর্ডের ঠিক মাঝখানে। ঘরের আলো কমিয়ে দিবি আর মনে মনে বলবি — 'If any good soul passes by — please come'. তখন আত্মাটা বোতামে চলে আসবে। বোতাম নড়তে থাকবে। তখন কোন প্রশ্ন করলে আত্মা জবাব দেবে।'

'কি ভাবে জবাব দিবে?'

'বোতামটা অক্ষরগুলির উপর যাবে। কোন্ কোন্ অক্ষরের উপর যাবে সেটা খেয়াল রাখতে হবে। ভূতটার নাম যদি হয় রহিম, তাহলে প্রথমে যাবে 'আর' — এর উপর, তারপর ' এ' — এর উপর, তারপর 'এইচ — বুঝতে পারছিস?'

'বোতামটা আপনাআপনি যাবে?'

'না, আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে রাখতে হবে।'

'ভাইয়া, ভূত কি সত্যি সত্যি আসে?'

'আরে দূর দূর। ভূত আছে নাকি যে আসবে? আমেরিকানদের এটা হচ্ছে পয়সা বানানোর একটা ফন্দি। এত সহজে আত্মা চলে এলে তো কাজই হত।'

আলাউদ্দিন আমেরিকানদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে মজার মজার গল্প বলতে লাগল। আলাউদ্দিনের মা রাহেলার মনে ক্ষীণ আশা, গল্প যেভাবে জমেছে তাতে মনে হয় না — ছেলে বৌকে নিয়ে হোটেলে যাবে। যদি সত্যি সত্যি যায় তাহলে তিনি মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না। এম্নিতেই বিদেশী বউয়ের কথায় অনেকেই হাসাহাসি করছে। জামশেদ সাহেবের স্ত্রী গতসপ্তাহে এসে সরু গলায় বললেন — বাঙালি ছেলেরা যে বিদেশে গিয়েই বিদেশিনী বিয়ে করে ফেলে ঐ সব বিদেশিনীগুলি নিচু জাতের। ঝি-জমাদারণী এই সব। ভদ্রলোকের মেয়েরা বাঙালি বিয়ে করতে যাবে কেন? ওদের গরজটা কি?

রাহেলা ক্ষীণ গলায় বললেন,

'আপনাকে কে বলেছে?'

'বলবে আবার কে? এ তো সবাই জানে। বাঙালি ছেলেগুলির সাদা চামড়া দেখে আর হুঁশ থাকে না। ওরা তো প্রথম প্রথম জানে না যে ঐ দেশের ঝিয়ের চামড়াও সাদা, আবার মেথরনীর চামড়াও সাদা।'

রাহেলা এসব কথার কোন জবাবদিতে পারেন নি। শুধু শুনে গেছেন। এখন যদি ছেলে বউ নিয়ে হোটেলে চলে যায় তাহলে কি হবে? সবই তো গায়ে থুথু দিবে।

অবশ্যি তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন ছেলে এবং ছেলের বউয়ের জন্যে একটা ঘর

ভালমত সাজাতে। নাসরিনের ঘরটাই সাজাতে হয়েছে। দেয়ালে চুনকাম করা হয়েছে। টিউব লাইট লাগানো হয়েছে। একটা ফ্যান ঘরে আছে। সেই ফ্যানে ঘটাং ঘটাং শব্দ হয় বলে নতুন একটা সিলিং ফ্যান কেনা হয়েছে। তারপরেও যদি ছেলে বৌ নিয়ে হোটেলে ওঠে, তিনি কি আর করবেন? তাঁর আর কি করার আছে?

রাতের খাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আলাউদ্দিন বলল, আমরা তাহলে ওঠি মা।

রাহেলা ক্ষীণ গলায় বললেন, কোথায় যাবি?

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বলল, কোথায় যাবি বল কেন মা? আগে ভাগে তো বলেই রেখেছি — একটা ভাল হোটেলে উঠতে হবে : ক্লারা গতরাতে এক ফোঁটা ঘুমায় নি। বেচারি গরমে সিদ্ধ হয়ে গেছে। বাতাস নেই এক ফোঁটা।

'ফ্যান তো আছে।'

'বাতাস গরম হয়ে গেলে ফ্যানে লাভ কি? তোমরা গরম দেশের মানুষ, ওর কষ্টটা কি বুঝবে? আমি নিজেই সহ্য করতে পারছিলাম না, আরও ...'

'বউকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে উঠলে লোকে নানা কথা বলবে।'

আলাউদ্দিন এই কথায় রাগে জ্বলতে লাগল। হড়বড় করে এমন সব কথা বলতে লাগল যার তেমন কেন অর্থ নেই।

তার বাবা মনসুর সাহেব, যিনি কখনোই কিছু বলেন না, তিনি পর্যন্ত বলে ফেললেন — তুই খামোকা চিৎকার করছিস কেন?

'আমি খামোকা চিৎকার করছি? আমি খামোকা চিৎকার করছি? আমি শুধু বলছি লোকজনের কথা নিয়ে তোমরা নাচানাচি কর কেন? তোমরা যদি না খেয়ে মর, লোকজন এসে তোমাদের খাওয়াবে? প্রতি মাসে দেড়শ' ডলারের যে মানি অর্ডারটা পাও সেটা কি লোকজন দেয়? বল, দেয় লোকজন?

মনসুর সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরিয়ে বললেন, যা-যেখানে যেতে চাস। আলাউদ্দিন তিক্ত গলায় বলল,

'তোমরা যে ভাবছ ছেলে ঘর ছেড়ে হোটেলে চলে যাচ্ছে, কাজেই ছেলে পর হয়ে গেল, এটা ঠিক না।'

'আমরা কিছু ভাবছি না। তুই আর ভ্যাজভ্যাজ করিস্ না। মাথা ধরিয়ে দিয়েছিস্।'

'মাথা ধরিয়ে দিয়েছি? আমি মাথা ধরিয়ে দিয়েছি?'

আট বছর পর ফিরে আসা পুত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় রাতেই বাড়ির সদস্যদের খণ্ড প্রলয়ের মত হয়ে গেল। নাসরিন মনে মনে বলল, বেশ হয়েছে। খুব মজা হয়েছে। আমি খুব খুশি হয়েছি।

ক্লারা ঝগড়ার ব্যাপারটা কিছুই বুঝল না। একবার শুধু ভুরু কুঁচকে বলল, তোমরা এত চেঁচিয়ে কথা বল কেন? বলেই জবাবের অপেক্ষা না করে বসার ঘরে টিকটিকি দেখতে গেল। বাংলাদেশের এই ছোট্ট প্রাণী তার হৃদয় হরণ করেছে। সে টিকটিকির একুশটা ছবি এ পর্যন্ত তুলেছে। ম্যাকরো লেন্স আনা হয় নি বলে খুব আফসোসও করছে। ম্যাকরো লেন্সটা থকলে ক্লোজআপ নেয়া যেত।

খুব সঙ্গত কারণেই গভীর রাত পর্যন্ত এ পরিবারের কোন সদস্য ঘুমুতে পারল না। বারান্দায় বসে রাহেলা ক্রামগত অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। এক সময় মনসুর সাহেব

বললেন, আর কেঁদো না, চোখ ঘা হয়ে যাবে। তোমার ছেলের আশা ছেড়ে দাও। বিদেশী পেত্নী বিয়ে করে ধরাকে সরা দেখছে। হারামজাদা!

নাসরিন আজ ওর ঘরে ঘুমুতে পারছে।

ঘরে ঢুকে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কত আগ্রহ করে তারা সবাই মিলে ঘর সাজিয়ে দিয়েছে, তবু ভাইয়ার পছন্দ হল না। এই ঘরটা কি হোটেলের চেয়ে কম সুন্দর হয়েছে? মাথার পাশে টেবিল ল্যাম্প। পায়ের দিকের দেয়ালে সূর্যাস্তের ছবি। খাটের পাশে মেরুণ রঙের বেড সাইড কার্পেট। জানালা খুলে ফুল স্পীডে ফ্যান ছেড়ে দিলে খুব একটা গরম কি লাগে? কই, তার তো লাগছে না। তার তো উল্টো। কেমন শীত শীত লাগছে।

সে টেবিল ল্যাম্প জ্বালাল। এত বড় খাটে একা ঘুমুতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। ভাইয়া থাকবে না জানলে বড় আপাকে জোর করে রেখে দিত। নাসরিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। আজ রাতটা তাদের জন্যে খুব খারাপ রাত। আজ রাতে তাদের কারোরই ঘুম হবে না। একা-একা জেগে থাকা খুব কষ্টকর।

ভূত নামালে কেমন হয়? ওইজা বোর্ড খুলে সে যদি বোতামটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে বসে থাকে তাহলে কি কিছু হবে? যদি কোন আত্মা চলে আসে ভালই হয়। আত্মার সঙ্গে গল্প করা যাবে। মুশকিল হচ্ছে, এই আত্মাগুলি আবার কথা বলে না। বোতাম ঠেলে ঠেলে মনের ভাব প্রকাশ করে।

নাসরিন দরজা বন্ধ করে ওইজা বোর্ড নিয়ে বসল। তর্জনী দিয়ে বোতামটা ছুঁয়ে নরম গলায় বলল — আমার আশেপাশে যদি কোন বিদেহী আত্মা থাকেন তাহলে তাঁদের মধ্যে একজন কি দয়া করে আসবেন? যদি আসেন তাহলে আমার মনটা একটু ভাল হবে। কারণ আজ আমার মনটা খুব খারাপ। কেন খারাপ তা তো আপনারা খুব ভাল করেই জানেন। পুরো ঘটনার সময় নিশ্চয়ই আপনারা আশেপাশে ছিলেন। ছিলেন না? এই পর্যন্ত বলেই নাসরিন চমকে উঠল। ডান হাতটা একটু যেন কাঁপছে।

বোতামটা কি নড়তে শুরু করেছে? অসম্ভব, হতেই পারে না। এ কি! বোতামটা এগিয়ে গেল কিভাবে? নাসরিন নিজেই হয়ত নিজের অজান্তে বোতাম ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেছে। খানিকটা ভয় এবং খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে নাসরিন অপেক্ষা করছে। হচ্ছেটা কি?

বোতাম 'ইয়েস' লেখা ঘরে কিছুক্ষণ থেমে আবার আগের জায়গায় ফিরে এল। নাসরিন শব্দ করেই বলল, বাহ্, বেশ মজা তো! পরবর্তি কিছুক্ষণ 'ইয়েস' এবং 'নো' তে বোতাম ঘুরতে লাগল। নাসরিনের শুরুর ভয় খানিকটা কমে গেল। যদিও তখনো বুক ধকধক করছে।

ওইজা বোর্ডে 'ইয়েস' এবং 'নো' ছাড়া আরো দু'টি ঘর আছে। সেগুলি হচ্ছে — 'আমি উত্তর দেব না', 'আমি জানি না'। বোতামটা এই সব ঘরেও মাঝে মাঝে এল। প্রশ্ন এবং উত্তর এইভাবে সাজানো যায়

'আপনি কি এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি এই বাড়িতেই থাকেন?'

'না।'

'আপনি কোথায় থাকেন?'

'আমি উত্তর দেব না।'

'আজ আমাদের সবার খুব মন খারাপ সেটা কি আপনি জানেন?'

'না।'

'কি জন্যে আমাদের মন খারাপ সেটা কি বলব?'

'না।'

'শুধু না—না করছেন কেন। একটু শুনলে কি হয়? বলি?'

'হ্যাঁ।'

'তার আগে বলুন আপনার নাম কি?'

বোতামটা ঘুরতে ঘুরতে এক্স ঘরে গিয়ে থামল। নাসরিন বলল, এক্স দিয়ে বুঝি কারোর নাম হয়? ঠিক করে নাম বলুন।

'আমি জানি না।'

'আপনি জানেন না মানে? আপনার কি নাম নেই?'

'না?'

'ভূতদের নাম থাকে না?'

' আমি জানি না।'

'সে কি! আমার তো ধারণা প্রেতাত্মারা সব জানে। আর আমি আপনাকে যা—ই জিজ্ঞেস করছি — আপনি বলছেন, আমি জানি না। আচ্ছ বলুন তো, উনিশকে তের দিয়ে গুণ দিলে কত হয়।'

'আমি জানি না।'

'আমিও জানি না। তবে আপনি যদি বলতেন তাহলে গুণ করে বের করতাম। আপনি কি গুণ অংক জানেন?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, আত্মাদের কি অংক করতে হয়?'

বোতাম এক জায়গায় স্থির হয়ে রইল। উত্তর দিল না। নাসরিন বলল, আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?

'হ্যাঁ।'

'প্লীজ, আমার উপর রাগ করবেন না। কেউ আমার সাথে রাগ করলে আমার খুব মন খারাপ থাকে। এমনিতেই আজ আমার খুব মন খারাপ। আপনি কি জানেন আমার যে মন খারাপ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন মন খারাপ সেই ঘটনাটা বলি? বলব?'

'হ্যাঁ।'

নাসরিন আজ সারাদিনের ঘটনা বলতে শুরু করল। বলতে বলতে দু'বার কেঁদে ফেলল। তার কাছে একবারও মনে হল না সে হাস্যকর একটা কাণ্ড করছে। এই সব গল্প বোতামটাকে বলার কোন মানে আছে?

নাসরিন ঘুমুতে গেল রাত তিনটায়। খুব চৎকার ঘুম হল। ঘুমিয়ে এত তৃপ্তি অনেকদিন সে পায় নি। তবে ঘুমের মধ্যে সারাক্ষণই মনে হল একজন বুড় মানুষ তার গায়ে হাত রেখে শুয়ে আছেন! বুড় মানুষটার শরীরে চুরুটের কড়া গন্ধ।

২.

ভোর সাতটায় আলাউদ্দিন এসে উপস্থিত।

সে ভোর হতেই বাসায় চলে আসবে, রাহেলা তা ভাবেন নি। আগের রাতের সব দুঃখ তিনি ভুলে গেলেন। হাসিমুখে বললেন, বৌমাকে আনলি না?

'ও ঘুমুচ্ছে। ঘুম ভাঙলে চলে আসবে। নোট লিখে এসেছি।'

'আসতে পারবে একা-একা?'

'আসতে পারবে না মানে? কি যে তুমি বল মা! ও কি আমাদের দেশের মেয়ে যে স্বামী ছাড়া এক পা ফেলতে পারে না।?'

' তা তো ঠিকই।'

রাহেলা নাস্তার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আলাউদ্দিনকে এখন অনেক সহজ ও স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। রান্না ঘরে মা'র পাশে বসে অনেক গল্প করতে লাগল। নাসরিন এবং মনসুর সাহেবও গল্পে যোগ দিলেন।'

'তুই তো ঐ দেশেই থেকে যাবি?'

'হ্যাঁ। এই দেশে আছে কি বল? এই দেশে থাকলে তো মরতে হবে না খেয়ে।'

'অনেকেই তো আছে।'

'কি রকম আছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি?

'তাও ঠিক।'

'নাসরিনও সহজভাবে ভাইয়ার সঙ্গে অনেক গল্প করল। এখন ভাইয়াকে খুব আপন লাগছে। কথা বলতে ভাল লাগছে।

'ভাইয়া, কাল ওইজা বোর্ড দিয়ে ভূত এনেছিলাম।'

'তাই নাকি?'

' হ্যাঁ। আপনাআপনি বোতাম এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যায়?'

'তুই নিশ্চয়ই ঠেলেছিস।'

'অনেস্ট ভাইয়া। মোটেই ঠেলিনি।

'তুই না ঠেললেও তোর সাব-কনসাস মাইণ্ড ঠেলেছে। আমি নিউজ উইক পত্রিকায় দেখেছিলাম — পুরো ব্যাপারটাই আসলে সাব-কনসাস মাইণ্ডের।'

এমন সহজ স্বাভাবিকভাবে যে মানুষটা গল্প করল, সে—ই আবার ঠিক সন্ধ্যাবেলা একটা ঝগড়া বাঁধিয়ে বসল। সাধারণ ঝগড়া না — কুৎসিত ঝগড়া। ব্যাপারটা এ রকম:

ক্লারা খাবার পানি চেয়েছে।

নাসরিন গ্লাসে করে পানি দিয়েছে। এক চুমুকে সেই পানি খেয়ে ক্লারা বলল —

থ্যাংকস। খুব ভালো পানি।

ক্লারা এখন কিছু কিছু বাংলা বলার চেষ্টা করে।

আলাউদ্দিন বলল, ফোটান পানি দিয়েছিস তো? বয়েলড ওয়াটার?

'না ভাইয়া। টেপের পানি।'

'কেন? তোদেরকে কি আগে বলি নি সব সময় বয়েলড পানি দিবি? পানি ফুটিয়ে পরে বোতলে ভরে রাখবি। সামান্য কথাটা মনে থাকে না? বয়স যত বাড়ছে তোর বুদ্ধি দেখি তত কমছে।'

নাসরিনের মুখ কালো হয়ে গেল।

মনসুর সাহেব মেয়েকে রক্ষা করার জন্যে বললেন, একবার মাত্র খেয়েছে, কিছু হবে না। আমরা তো সব সময় খাচ্ছি।

'তোমাদের খাওয়া আর ক্লারার খাওয়া এক হল? মাইক্রো অরগানিজম খেয়ে খেয়ে তোমরা ইমিউন হয়ে আছ। ও-তো হয় নি।'

'যা হবার হয়ে গেছে। এখন চিৎকার করে আর কি হবে?'

'চিৎকার করছি নাকি? তোমাদের সঙ্গে দেখি সামান্য আর্গুমেন্টও করা যায় না!'

নাসরিন অনেক চেষ্টা করেও কান্না আটকাতে পারল না। মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে দ্রুত বের হয়ে গেল। রাহেলা মৃদু স্বরে বললেন, দিলি তো মেয়েটাকে কাঁদিয়ে! ভারী অভিমানী মেয়ে। রাতে তো খাবেই না।

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বলল, এত অল্পতেই যদি চোখে পানি এসে যায় তাহলে তো মুশকিল। একটা ভুল করলে আর ভুল ধরিয়ে দেয়া যাবে না।?

'ও ছেলে মানুষ।'

'ছেলে মানুষ কি বলছ? সেতেরো-আঠারো বছরে কেউ ছেলে মানুষ থাকে? তোমাদের জন্যে বড় হতে পারে না। তোমরা ছেলে মানুষ বানিয়ে রেখে দাও।'

আলাউদ্দিন রাতে খেল না। বউকে নিয়ে না—কি নিরিবিলি কোথাও ডিনার করবে।

নাসরিন সেই রাতে ঘুমুতে গেল না-খেয়ে। অনেকক্ষণ জেগে রইল। ঘুম এল না। তার খুব কষ্ট হচ্ছে। মরে যেতে ইচ্ছা করছে। অনেক রাতে সে ওইজা বোর্ড নিয়ে বসল। আজ আর দেরি হল না। বোতামে হাত রাখামাত্র বোতাম নড়তে লাগল। আজ সে উত্তরগুলোও শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়ে দিচ্ছে না। অক্ষরের উপর ঘুরে ঘুরে — ছোট ছোট শব্দ তৈরি করছে। মজার মজার শব্দ। নাসরিন এই শব্দগুলোতে গুরুত্ব দিচ্ছে না, আবার গুরুত্ব দিচ্ছেও। একবার ভাবছে — এগুলো অবচেতন মনের ইচ্ছা, আরেকবার ভাবছে — হতেও তো পারে। হয়ত সত্যি কেউ এসেছে। পৃথিবীতে রহস্যময় ব্যাপারটা তো হয়। ক'টা রহস্যের সমাধান আমরা জানি? কি যেন বলেছেন শেক্সপীয়র — There are many things . . . .

'আপনি কি এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কাল যিনি এসেছিলেন আজও কি তিনিই এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার নাম?'

'X' 'কি অদ্ভুত নাম! আচ্ছা, আপনি কি জানেন আজ আমার মন কালকের চেয়েও খারাপ?'

'জানি।'

' কি করা যায় বলুন তো?'

'আমি জানি না।'

'আপনি কি জানেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভাল লাগে?'

'জানি।'

'ভাইয়া বলছিল, এই যে আপনি নানান কথা বলছেন এগুলো আসলে আমার মনের অবচেতন ইচ্ছার প্রতিফলন।'

'হতে পারে।'

'ভাইয়াকে আমার দারুণ পছন্দ।'

'আমি জানি।'

'ঐ পচা মেয়েটা সব নষ্ট করে দিয়েছে। আমার মনে হয় মেয়েটা ডাইনি। ও আশেপাশে থাকলেই ভাইয়া অন্য রকম হয়ে যায়। তখন সবার সঙ্গে ঝগড়া করে।'

'জানি।'

'কি করা যায় বলুন তো?'

'মেয়েটাকে মেরে ফেল।'

'ছিঃ, কি যে বলেন! মানুষকে মেরে ফেলা যায় না — কি?'

'হ্যাঁ, যায়।'

'কিভাবে?'

'অনেক ভাবে।'

'আপনার কথাবার্তার কোন ঠিক নেই। আপনি কি করে ভাবলেন আমি একটা মানুষ মারতে পারি?'

'সবাই পারে।'

'আপনি পারেন?'

'না।'

'আপনি পারেন না কেন?'

'আমি জানি না।'

'মানুষ মারা যে মহাপাপ এটা কি আপনি জানেন?'

'আমি জানি না।'

'আপনি আসলে কিছুই জানেন না।'

'হতে পারে।'

'তাছাড়া আপনি আরেকটা জিনিস ভুলে যাচ্ছেন — ধরুন, আমি ঐ পচা মেয়েটাকে মেরে ফেললাম, তখন পুলিশ কি আমাকে ছেড়ে দেবে? আমাকে ধরে নিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে না?'

'তা দিতে পারে।'

'আর ভাইয়ার অবস্থাটা তখন চিন্তা করে দেখুন। কি রকম রাগ সে করবে।

টাকাপয়সা দেয়া বন্ধ করে দেবে। আমরা তখন না খেয়ে মারা যাব। বাবার এক পয়সা রোজগার নেই, আমাদের ব্যাংকে টাকাপয়সা নেই। ভাইয়া প্রতিমাসে যে টাকা পাঠায় ঐটা দিয়ে আমরা চলি। ভাইয়া প্রতিমাসে কত পাঠায় বলুন তো?'

'আমি জানি না।'

'একশ' ডলার। একশ' ডলারে বাংলাদেশি টাকায় কত হয় তা জানেন?'

'না।'

'বেশি না, সাড়ে তিন হাজার। মা এবার কি ঠিক করে রেখেছে জানেন? মা ঠিক করে রেখেছে — ভাইয়াকে বলবে আরো কিছু বেশি টাকা পাঠাতে। একশ' ডলারে হচ্ছে না। জিনিসপত্রের যা দাম! আপনাদের তো আর কোন কিছু কিনতে হয় না। আপনারা আছেন সুখে, তাই না?

'আমি জানি না।'

'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ভাইয়া টাকার পরিমাণ বাড়াবে?'

'আমি জানি না।'

'না বাড়ালে আমাদের খুব কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, বাড়াবে না। বিয়ে করেছে, খরচ বেড়েছে। তাই না?'

'হতে পারে।'

'টাকা না বাড়ালে কি হবে বলুন তো? আমার আরেক ভাই আছেন — জসিম ভাইয়া। চিটাগাং—এ থাকেন। তাঁর টাকাপয়সা ভালই আছে। কিন্তু সে আমাদের একটা পয়সা দেয় না। আমরা যদি না খেয়ে মরেও যাই, সে ফিরেও তাকায় না। কি করা যায় বলুন তো?'

'ক্লারাকে মেরে ফেলা যাক।'

'বারবার আপনি এক কথা বলেন কেন? আপনার কাছে বুদ্ধি চাচ্ছি।'

'ওকে মেরে ফেলাই একমাত্র বুদ্ধি।'

'যান। আপনার সাথে আর কথাই বলব না।'

নাসরিন ওইজা বোর্ড বন্ধ করে ঘুমুতে গেল। আজ আর গতরাতের মত চট করে ঘুম এল না। একটু যেন ভয় ভয় করতে লাগল। ওইজা বোর্ড টেবিলের উপর রাখা হয়েছে। তার কাছেই চেয়ার। নাসরিনের কেন জানি মনে হচ্ছে চেয়ারে ঐ মিঃ এক্স বসে আছেন। বুড় ধরনের একজন মানুষ যার গায়ে চুরুটের গন্ধ। ঐ বুড় মানুষটার একটা চোখ ছানিপড়া। গায়ে চামড়ার কোট। সেই কোটেও এক ধরনের ভ্যাপসা গন্ধ।

নাসরিন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তার স্পষ্ট মনে হচ্ছে, কেউ একজন আছে। নাসরিন ভয়ে ভয়ে বলল, আপনি কি আছেন? চেয়ারে নড়ে উঠল। সত্যি নড়ল? না মনের ভুল? নাসরিন ক্ষীণ স্বরে বলল,

'আপনি দয়া করে বসে থাকবেন না। চলে যান। যখন আপনাকে দরকার হবে আমি ডাকব।'

আবার চেয়ার নড়ল। নিশ্চয়ই মনের ভুল।

নাসরিনের বড় ভয় লাগছে। জুন মাসের এই প্রচণ্ড গরমের রাতেও একটা চাদরে সারা শরীর ঢেকে সে শুয়ে রইল। ঘুম এল একেবারে শেষ রাতে। তাও গাঢ় ঘুম না

আজেবাজে সব স্বপ্ন। একটা স্বপ্ন তো খুবই ভয়ঙ্কর। তার শাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। সে অনেক চেষ্টা করছে আগুন নেভাতে। পারছে না। যতই চেষ্টা করছে আগুন আরো ছড়িয়ে পড়ছে। একজন বুড়োমত লোক চুরুট হাতে পুরো ব্যাপারটা দেখছে কিন্তু কিছুই করছে না।

টাকার পরিমাণ বাড়ানোর দাবি রাহেলা অনেক ভনিতার পর করলেন। বলতে তাঁর খুবই লজ্জা লাগল কিন্তু কোন উপায় নেই।

আলাউদ্দিন তখন চা খাচ্ছিল। চায়ের কাপ নামিয়ে বিস্মিত গলায় বলল, টাকা বাড়াতে বলছ'?

'হ্যাঁ।'

'একশ' ডলারে তোমাদের হচ্ছে না'?'

'না।'

'তোমরা কি পাগল-টাগল হয়ে গেলে? আমেরিকায় কি আমি টাকার চাষ করেছি'? ট্রাক্টার দিয়ে জমি চষে টাকার চারাগাছ বুনে দিচ্ছি?'

রাহেলা ক্ষীণ স্বরে বললেন,

'সংসার অচল।'

'সংসর তো আমারটা আরো বেশি অচল। বিয়ে করেছি — নতুন সংসার। অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছি। একটা জিনিস নেই অ্যাপার্টমেন্টে। ক্লারা অফিস করে, তার একটা আলাদা গাড়ি দরকার। তোমাদের টাকা তো বাড়াতে পারবই না বরং কিছু কমিয়ে দেব বলে ভাবছি।'

'আমাদের চলবে কিভাবে?'

'জসিম ভাইকে বল। তারও তো কিছু দায়িত্ব আছে। সে তো গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরছে।'

রাহেলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। আলাউদ্দিন বিরক্ত স্বরে বলল, এরকম ঘনঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে না মা। নিঃশ্বাস ফেলে সমস্যার সমাধান হয় না।

৩.

নাসরিন ওইজা বোর্ড নিয়ে বসেছে। রাত প্রায় দুটো। আজ অন্য দিনের মত গরম নয়। সন্ধ্যাবেলায় তুমুল বর্ষণ হয়েছে। আকাশ মেঘলা। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবারো হয়ত বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির ছাঁট আসছে বলে জানালা বন্ধ।

'আপনি কি আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের কি বিপদ হয়েছে শুনেছেন'?'

'না।'

'ভাইয়া টাকাপয়সা বেশি তো পাঠাবেই না, বরং আরো কমিয়ে দিয়েছে।'

'ও আচ্ছা।'

'কি করব আমরা বলুন তো?'

' মেয়েটাকে মেরে ফেল।'

'এইটা ছাড়া বুঝি আপনার মাথায় আর বুদ্ধি নেই।'

'না। এটা সবচে' ভাল বুদ্ধি।'

'আপনার সঙ্গে আমার কথা বলতেই ইচ্ছা করছে না।'

'শুনে দুঃখিত হলাম।'

'আচ্ছা, ঐদিন আপনি আমাকে ভয় দেখালেন কেন'? আপনি কি ঐ চেয়ারটায় বসেছিলেন'? আমার মনে হয় আপনি এখনো চেয়ারটায় বসে আছেন।'

'ক্লারাকে আগুনে পুড়ে মারলে কেমন হয়?'

'আপনি আজেবাজে কথা বলবেন না তো। আচ্ছা বলুন তো, ঐদিন কি আপনি চেয়ারে বসেছিলেন'?'

'তুমি একটু সাহায্য করলেই হয়।'

'কি সাহায্য'?'

'যখন আগুন জ্বলে উঠবে তখন এই ঘরের দরজা তুমি বাইরে থেকে বন্ধ করে দেবে।'

'আপনার কথাবার্তার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আগুন লাগার পর মেয়েটা যাতে বেরুতে না পারে।'

'কি বলছেন আপনি'?'

'আগুন লাগার পর সে ছুটে বের হতে চাইবে। তখন তাকে শুধু আটকানো। অল্প কিছুক্ষণ আটকে রাখা।'

'চুপ করুন তো।'

'ভাল বুদ্ধি দিচ্ছি।'

'আপনার বুদ্ধি চাই না।'

'তুমি আমার বন্ধু।'

'না, আমি আপনার বন্ধু নই।'

আজ রাতে নাসরিন এক পলকের জন্যেও চোখ এক করতে পারল না। মনে মনে ঠিক করে ফেলল ওইজা বোর্ডটা ভোর হতেই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে। কি সর্বনাশের কথা! বোতামটা এমন অদ্ভুত কথা বলছে কেন?

৪.

আগামীকাল রাত দু'টার ফ্লাইটে আলাউদ্দিন চলে যাবে। শেষ রাতটা এ বাড়িতে থাকবার জন্যে এসেছে, দীর্ঘদিন হোটেলে থাকায় তাকে বেশ লজ্জিতও মনে হচ্ছে। আজ রাতটা থাকতে তেমন কষ্ট হবে না। বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। আবহাওয়া অসহনীয় নয়। ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে।

আলাউদ্দিন বসার ঘরে সবার সঙ্গে গল্প করছে। গল্প বেশ জমে উঠেছে। প্রথমদিকে আমেরিকায় সে কি সব বিপদে পড়েছিল তার গল্প। প্রতিটি গল্পই আগে অনেকবার করে শোনা, তবু সবাই খুব আগ্রহ করে শুনছে।

ঘরে ইলেকট্রিসিটি নেই। বিকেলে ঝড়বৃষ্টির সময় ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছে, এখনো আসে নি। আজ রাতে আর আসবে বলে মনে হয় না। ঝড়বৃষ্টি এখনো হচ্ছে।

বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ, বৃষ্টির ঝমঝমানি, দমকা হাওয়ার ঝাপ্টা — চমৎকার পরিবেশ।

একটি মাত্র হারিকেন, সেটা বসার ঘরে। হারিকেন ঘিরে সবাই বসে আছে।

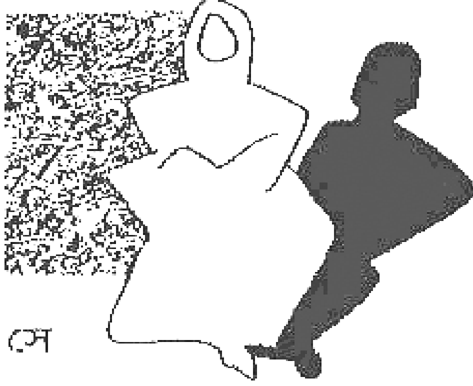
ক্লারা ওদের গল্পে কোন মজা পাচ্ছিল না, ঘনঘন হাই তুলছিল। মাঝরাতে সে ঘুমুতে গেল। নাসরিন তার ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

দুর্ঘটনা ঘটল তারো মিনিট দশেক পর, গল্প তখন খুব জমে উঠেছে। শুরু হয়েছে ভূতের গল্প। রাহেলা ছোটবেলায় নিশির ডাক শুনে ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিলেন, সেই গল্প হচ্ছে। গা ছমছমানো পরিবেশ। ঠিক তখন তীক্ষ্ণ গলায় নাসরিন বলল,

ঘর এত আলো হয়ে গেছে কেন ভাইয়া'? তার কথা শেষ হবার আগেই শোনা গেল গোঙানি ও চিৎকার। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে এবং ক্লারা চেঁচাচ্ছে — Oh God! Oh God!

সবাই ছুটে গেল শোবার ঘরের দিকে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

দুর্ঘটনা তো বটেই। দুর্ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। বাতাসে মোমবাতি কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল নেটের মশারিতে। সেখান থেকে ক্লারার নাইট গাউনে। সিনথেটিক কাপড় — মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠল। খুবই সহজ ব্যাখ্যা। শুধু একটি ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। ক্লারার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। কেউ একজন বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়েছিল। আগুন লেগে যাবার পর ক্লারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে ঘর থেকে বেরুতে। বেরুতে পারে নি। চিৎকার করে দরজা খুলতে বলেছে — ঝড়বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের সঙ্গে তার চিৎকারও কেউ শুনে নি। ব্যাকুল হয়ে শেষ মুহূর্তে সে ঈশ্বরকে ডাকছিল। ঈশ্বর মানুষের কাতর আহ্বানে সাধারণত বিচলিত হন না।



সে

আমার ছোট মেয়ের গলায় মাছের কাঁটা ফুটেছিল।

মাছের কাঁটা যে এমন যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার তা জানা ছিল না। বেচারি ক্রমাগত কাঁদছে। কিছুক্ষণ পরপর বমি করছে, হেঁচকি উঠছে। চোখ-মুখ ফুলে একাকার। আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম।

অনেক ধরনের লৌকিক চিকিৎসা করান হল। শুকনো ভাতের দলা গেলানো, মধু খাওয়ানো, গলায় সেঁক। এক পর্যায়ে আমাদের কাজের মেয়েটি বলল, একটা বিড়াল এনে তার পায়ে ধরলে কাঁটা চলে যাবে। গ্রামদেশে না-কি এইভাবে গলার কাঁটা দূর করা হয়।

বিপদে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। হাতের কাছে বেড়াল থাকলে হয়ত-বা বেড়াল চিকিৎসাও করাতাম। ডাক্তারের কথা একবারও মনে হয় নি। কারণ, মনে হলেও লাভ হত না। আটচল্লিশ ঘন্টার হরতাল চলছে। ঢাকা শহর অচল। পুলিশের সঙ্গে জনতার কিছু কিছু খণ্ড সংঘর্ষ হচ্ছে বলেও খবর আসছে। দুটি পেট্রোল পাম্পে না-কি আগুন লাগান হয়েছে। কয়েকজন মারাও গেছে। শহরভর্তি গুজব। শোনা যাচ্ছে, এরশাদ সরকারের পতন হয়েছে। তিনি তাঁর প্রিয় গলফ্ সেট বিক্রি করে দিয়েছেন। একটা হেলিকপ্টার নাকি বঙ্গভবনে রেডি অবস্থায় আছে।

এই অবস্থায় মেয়ে কোলে নিয়ে রাস্তায় নামলাম। মেয়ে একটু পরপর কান্না থামিয়ে জিজ্ঞেস করছে— বাবা, আমি কি মরে যাচ্ছি?

সাত বছরের মেয়ে এই জাতীয় প্রশ্ন করলে বুক ভেঙে যায়। আমার নিজেরো চোখে পানি এসে গেল।

যখন প্রয়োজন থাকে না তখন মোড়ে মোড়ে ফার্মেসি দেখা যায়। সেই সব ফার্মেসিতে গম্ভীর মুখে ডাক্তার বসে থাকেন। আজ কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কোন ফার্মেসি খোলা নেই। দুজন ডাক্তারের বাসায় গেলাম—একজন, বাসায় ছিলেন না, অন্যজন মেয়েকে না দেখেই বললেন, মেডিক্যালে নিয়ে যান।

মেডিক্যালেই নিয়ে যেতাম, তবু কেন জানি সাইনবোর্ড দেখে দেখে তৃতীয়

একজন ডাক্তার খুঁজে বের করলাম। ইনি তিনতলায় থাকেন। সাইনবোর্ডে লেখা—'স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ'। গলায় কাঁটা ফোটা নিশ্চয়ই স্ত্রীরোগ নয়, তবু গেলাম যদি কিছু করতে পারেন।

ডাক্তারের নাম হাসনা বানু। ছোটখাট মানুষ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ভদ্রমহিলার মধ্যে মাতৃভাব অত্যন্ত প্রবল। একদল মানুষ আছে যাদের দেখলেই আপনজন মনে হয়। প্রথম দর্শনেই তাঁকে এরকম মনে হল। তিনি আমার মেয়েকে চেয়ারে বসিয়ে হাঁ করালেন। গলায় টর্চের আলো ফেলে চিমটা দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে এক ইঞ্চি লম্বা একটা কাঁটা বের করে ফেললেন। অতি কোমল গলায় বললেন, মা-মণি, ব্যথা কমেছে?

আমার মেয়ে চুপ করে রইল। সে বোধহয় তখনো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। ডাক্তার হাসনা বানু বললেন, কি মেয়ে, আমার সঙ্গে কথা বলবে না?

আমার মেয়ে হেসে ফেলল।

'এখন বল তুমি কি খাবে। আইসক্রিম খাবে? দেব একটু আইসক্রিম?'

'ভ্যানিলা আইসক্রিম থাকলে খাব।'

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ভ্যানিলা আইসক্রিম আছে।

ভদ্রমহিলার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। আমি তাঁকে চিকিৎসার জন্যে কিছু টাকা দিতে গেলাম। তিনি শান্ত গলায় বললেন, ডাক্তারি যখন করি তখন চিকিৎসার টাকা তো নেবোই কিন্তু তাই বলে বাচ্চা একটা মেয়ের গলার কাঁটা বের করারও ফি দাবি করব এটা কি করে ভাবলেন? কাঁটাটা বের করার পর আপনার মেয়ের হাসি আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। এ হাসির দাম লক্ষ টাকা। তাই না?

মিসেস হাসনা বেগমের সঙ্গে এই হচ্ছে আমর পরিচয়ের সূত্র। পরিচয় দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তিনি নিউক্লিয়ার মেডিসিনে গবেষণায় একটি বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবার পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখন যে গল্পটি বলব সেটি তাঁর কাছে শোনা। যেভাবে শুনেছি অবিকল সেভাবে গল্পটি বলার চেষ্টা করছি।

মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করে বেরুবার পরপর আমি একটা ক্লিনিকে চাকরি নেই। এখন যেমন চারদিকে ক্লিনিকের ছড়াছড়ি তখন তেমন ছিল না। অল্প কয়েকটা ক্লিনিক ছিল—সবই মাতৃসদন। আমি যে ক্লিনিকে চাকরি নেই সেটা সেই সময়ের খুব নামী ক্লিনিক। ধনী পরিবরের মারাই শুধু আসতেন। সুযোগ-সুবিধা ভাল ছিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিমছাম ক্লিনিক। সর্বসাকুল্যে পনেরোটি বেড ছিল। দশটি 'এ' ক্যাটাগরির, পাঁচটি 'বি' ক্যাটাগরির। 'এ' ক্যাটগরির ঘরগুলোতে এয়ারকুলার বসান ছিল। আমরা ডাক্তার ছিলাম তিনজন। প্রধান ডাক্তার মেডিক্যাল কলেজের একজন অধ্যাপক। আমি এবং নাসিমা—আমরা দুজন সদ্য পাস-করা ডাক্তার। অবশ্যি সব কাজ আমরা দুজনই দেখতাম। যেহেতু ছোট ক্লিনিক, আমাদের কোন অসুবিধা হত না। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের ক্লিনিকে আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে ভর্তি হল। প্রথম মা হতে যাচ্ছে। ভয়ে অস্থির। আমি প্রাথমিক পরীক্ষা করে দেখলাম এখনো অনেক দেরি। একেকটা কনট্রেকশানের ভেতর গ্যাপ অনেক বেশি। আমি তাঁকে আশ্বস্ত

করলাম। বললাম, ভয়ের কিছু নেই।

মেয়েটি করুন গলায় বলল, তুমি তো বাচ্চা মেয়ে! তুমি পারবে? তুমি জান সবকিছু?

আমি হেসে ফেললাম। হাসতে হাসতেই বললাম, আমি বাচ্চা নই। তাছাড়া আমি একজন খুব ভাল ডাক্তার। আপনার কোন ভয় নেই। আমি ছাড়াও এখানে ডাক্তর আছেন। একজন প্রফেসর আছেন। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাকে দেখবেন।

রোগিনী বললেন, ভাই, তোমাকে তুমি করে বলেছি বলে রাগ কর নি তো?

'না।'

'আমার এমন বদঅভ্যাস যাকে পছন্দ হয় তাকেই তুমি বলে ফেলি।'

আমি কাগজপত্র ঠিকঠাক করবার জন্য ভদ্রমহিলার স্বামীকে নিয়ে অফিসে চলে এলাম। দেখা গেল, খুবই ক্ষমতাবান পরিবারের বউ। সাত-আটটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হোমরা-চোমরা ধরনের কিছু মানুষ বিরক্ত মুখে হাঁটাহাঁটি করছে। একজন অতি বিরক্ত গলায় বলছে, আপনাদের ব্যবস্থা তো মোটেই ভাল না। ইমার্জেন্সী হলে পেশেন্টকে আপনারা কি করবেন? এখানে কি অপারেট করার ব্যবস্থা আছে?

'জ্বি-আছে।'

'আপনাদের নিজস্ব জেনারেটর আছে? ধরুন, হঠাৎ? যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায়, তখন? তখন কি করবেন? মোমবাতি জ্বালিয়ে তো নিশ্চয়ই অপারেশন হবে না?'

লোকগুলি আমাদের বিরক্ত করে মারল। দাড়িয়ালা এক ভদ্রলোক বললেন, আপনাদের এখান থেকে আমরা বেশকিছু টেলিফোন করব। দয়া করে বিরক্ত হবেন না। সব পেমেন্ট করা। 'মানি উইল নট বি এ প্রবলেম।'

রোগিনী ভর্তি হয়েছেন বিকেলে। রাত নটা বাজার আগেই স্রোতের মত মানুষ আসতে লাগল। অনেকের হাতে ফুলের গুচ্ছ। অনেকর হাতে উপহারের প্যাকেট। বিশ্রী অবস্থা।

আমি সহজে ধৈর্য হারাই না। আমারও শেষ পর্যন্ত মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমি বললাম, আপনারা কি শুরু করেছেন? এটাকে একটা বাজার বানিয়ে ফেলেছেন। দয়া করে ভীড় পাতলা করুন। একজন শুধু থাকুন। ডেলিভারি হোক, তখন আসবেন।

আমার কথায় একজন ভদ্রমহিলা, সম্ভবত মেয়ের শাশুড়ি হবেন, চোখ-মুখ লাল করে বললেন, আপনি কি জানেন এই মেয়ে কোন্ বাড়ির বউ?

আমি বললাম, আমি জানি না। আমি জানতেও চাই না। সে আমার পেশেন্ট — এটুকু শুধু জানি। আর দশটা পেশেন্টকে আমি যেভাবে দেখব তাকেও একইভাবে দেখা হবে।

'আর দশটা বউ এবং আমার ঘরের বউ এক?'

'আমার কাছে এক?'

'জান আমি এই মুহূর্তে তোমার চাকরি খেতে পারি?'

আমি শীতল গলায় বললাম, আপনি আমার চাকরি খেতে পারেন না। চিকিৎসক হিসেবে আমার কোন ব্যর্থতা পাওয়া গেলে তবেই চাকরি যেতে পারে। তার আগে নয়। আপনি শুধু শুধুই চেঁচামেচি করছেন।

ভদ্রমহিলা রেগে গিয়ে—স্কাউনড্রেল, লোফার এইসব বলতে লাগলেন। একজন ভদ্রমহিলা এমন কুৎসতি ভাষায় কথা বলতে পারেন আমার জানা ছিল না। বিরাট হৈচৈ বেঁধে গেল। আমাদের প্রফেসর এলেন। ভেবেছিলাম তিনি আমার পক্ষে কথা বলবেন। তা বললেন না। আমার উপর অসম্ভব রেগে গেলেন। আমাকে অবাক করে দিয়ে সবার সামনে উঁচু গলায় বললেন—হাসনা, তোমাকে এখানে চাকরি করতে হবে না। ইউ ক্যান লিভ।

আমি আমার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার প্রফেসর জানেন কত আগ্রহ, কত যত্ন নিয়ে আমি এখানে কাজ করি। অথচ তিনি ....

আমি রিকশা নিয়ে বাসায় চলে এলাম। সহজে আমার চোখে পানি আসে না কিন্তু রিকশায় ফিরবার পথে খুব কাঁদলাম। তখন বয়স অল্প। মন ছিল খুব স্পর্শকাতর।

রাত এগারোটায় প্রফেসর আমাকে নিতে এলেন। করুন গলায় বললেন, হাসনা, খুব কেলেংকারি হয়ে গেছে। তুমি চলে আসার পর ক্লিনিকের কেউ কোন কাজ করছে না। অসহযোগ আন্দোলন। এ রকম যে দাঁড়াবে কল্পনা করি নি। এখন তুমি চল।

আমি বললাম, স্যার, আমার যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি রোগীর আত্মীয়দের বলুন তাকে অন্য কোন ক্লিনিকে নিয়ে যেতে।

'বলেছিলাম। পেশেন্ট যাবে না। সে এখানেই থাকবে।'

'এখানেই থাকবে?'

'হ্যাঁ, এখানেই থাকবে। এবং সে বলে দিয়েছে, ডেলিভারির সময় তুমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকতে পারবে না। এখন তুমি যদি না যাও আমার খুব মুশকিল হবে। আমি খুব বিপদে পড়ব। তুমি তো বাইরের জগতের কোন খোঁজখবর রাখ না। যদি রাখতে তাহলে বুঝতে এই মেয়ে কোন্ পরিবারের মেয়ে। বাংলাদেশের মত দেশে এরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তুমি চল।'

'স্যার, আমি যাব না। ওরা যা ইচ্ছে করুক।'

'হাসনা, অন্য সবকিছু বাদদাও। তুমি পেশেন্টের দিকে তাকাও। সে তোমার উপর নির্ভর করে আছে। আমার উপর তোমার রাগটা বড়, না পেশেন্টের প্রতি তোমার দায়িত্ব বড়?'

আমি শাল গায়ে বের হয়ে এলাম। ক্লিনিকে তখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ওয়েটিং রুমে তিনজন শুধু বসে আছেন। রোগিনীর কাছে দুজন। দুজনের একজন রোগিনীর শাশুড়ি। তিনি আমাকে দেখেই শীতল গলায় বললেন, রাগের মাথায় কি সব বলেছি কিছু মনে রেখো না—মা। রাগ উঠলে আমার মাথা ঠিক থাকে না।

আমি বললাম, আমি কিছু মনে রাখি নি।

'বৌমা তখন থেকে বলছিল সে তোমাকে যেন কি বলতে চায়। তুমি ওর কথাটা শোন। ও-খুব ভয় পেয়েছে।'

আমি মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়ালাম।

মেয়েটি ক্ষীণ স্বরে বলল, আপনারা ঘর থেকে যান, মা। আমি ওর সঙ্গে একা কথা বলব। আর কেউ যেন না থাকে।

ভদ্রমহিলা দুজন অনিচ্ছার সঙ্গে ঘর ছেড়ে গেলেন। মেয়েটা বলল, ভাই, তুমি

দরজটা বন্ধ করে দাও।

'তার কি দরকার আছে?'

'আছে, তুমি লক কর। তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে। দরজা বন্ধ করে তুমি আমার পাশে এসে বস।'

আমি তাই করলাম। কনট্রেকশানের সময় কমে এসেছে। ব্যথার ধকল সামলাতে মেয়েটির খুবই কষ্ট হচ্ছে। তার গলার স্বর পাল্টে গেছে। মনে হচ্ছে সে অনেক দূর থেকে কথা বলছে। সে আমার হাত ধরে বলল, ভাই, তোমার কি রাগ কমেছে?

'হ্যাঁ কমেছে।'

'তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে বল যে তোমার রাগ কমেছে।'

আমি তার কপালে হাত রেখে বললাম, আমার রাগ কমেছে।

'আমি তোমাকে তুমি তুমি করে বলছি বলে রাগ করছ না তো? তুমি নিশ্চয়ই বয়সে আমার বড়।'

'আমি মোটেই রাগ করি নি।'

'আমি সবাইকেই তুমি তুমি বলি না। যাদের আমার খুব প্রিয় মনে হয় খুব আপন মনে হয় তাদেরকে আমি তুমি বলি। তোমাকে প্রথম দেখেই আমার ভাল লেগেছে। তুমিও কিন্তু আমাকে তুমি বলবে।'

'কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি বরং চুপ করে থাক। বড় বড় করে নিঃশ্বাস নাও। আমার মনে হয় তোমার প্লাসেনটা ভাঙতে শুরু করেছে।'

' আর কত দেরি?'

'এখনো দেরি আছে। রাত তিনটার আগে কিছু হবে না। রাত তিনটা পর্যন্ত তোমাকে কষ্ট করতে হবে।'

'এখন ক'টা বাজে?'

'বারোটা একুশ।'

'মনে হচ্ছে ঘড়ি চলছেই না।'

আমি ওঠে দাঁড়ালাম। কিছু রুটিন কাজ আছে। এগুলো সারতে হবে। নরম্যাল ডেলিভারি হবে, বাচ্চার পজিশন ঠিক আছে। তবু ইমার্জেন্সির জন্যে তৈরি থাকা ভাল।

মেয়েটি বলল, যে জন্যে তোমাকে বসিয়েছিলাম তা এখনো বলি নি। তুমি বস। ওঠে দাঁড়ালে কেন? আসল কথা তো বলি নি।

আমি বসলাম।

মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, ওরা আমার বাচ্চাটিকে মেরে ফেলবে।

আমি চমকে উঠলাম। এই মেয়ে এসব কি বলছে! প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আবোল-তাবোল বকছে না তো?

'আমি জানি ওরা আমার বাচ্চাটিকে মেরে ফেলবে।'

'কারা?'

'আমার শ্বশুরবাড়ির লোকরা। ডাক্তার, নার্স সবাইকে টাকা দিয়ে কিনে ফেলেছে। তোমাকেও কিনবে। তারপর বাচ্চাটাকে মারবে।'

'তুমি এসব কি বলছ?'

'ওরা বাচ্চাটাকে মারবে কেন?'

মেয়েটি জবাব দিল না। ব্যথার প্রবল ঝাপ্টা সামলাবার চেষ্টা করল। আমি তাকে সময় দিলাম। আমার মনে হল মেয়েটা সম্ভবত পুরোপুরি সুস্থ নয়। হয়ত কিছু অস্বাভাবিকতা তার মধ্যে আছে।

'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না, তাই-না।?'

'না।'

' যা সত্যি তাই আমি বললাম।'

'তুমি জানলে কি করে — ওরা বাচ্চাটিকে মেরে ফেলতে চায়?'

'আমাকে বলেছে।'

' কে বলেছে?'

'আমার বাচ্চাটা আমাকে বলেছে।'

আমি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হলাম মেয়েটার মাথা খারাপ। সম্ভবত সে পরিবারিক জীবনে খবু অসুখী। শ্বশুরবাড়ির কাউকে তার পছন্দ না। সবাইকে সে শত্রুপক্ষ ধরে নিয়েছে। মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুমি আমার কথা এক বর্ণও বিশ্বাস কর নি, তাই না?

'তুমি ঠিকই ধরেছ। বিশ্বাস করার কথা না। তোমার বাচ্চা তোমাকে কি করে বলবে?'

'ও আমাকে স্বপ্নে বলেছে। একবার না, অসংখ্যবার বলেছে।'

'স্বপ্নে বলেছে!'

'হ্যাঁ, স্বপ্নে। গতকাল শেষ রাতেও স্বপ্নে দেখেছি।'

'কি দেখেছ?'

'দেখলাম আমার বাচ্চাটা আমাকে বলছে — মা, সবাই মিলে আমাকে মেরে ফেলবে। সবাই যুক্তি করে আমাকে মারবে। মা, আমি কি করি?'

বলতে বলতে মেয়েটি থর থর করে কাঁপতে লাগল।

আমি তাকে বললাম, প্রথমবার যেসব মেয়ে কনসিভ করে তাদের প্রায় সবাই ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখে। যেমন — তারা মারা যাচ্ছে, মৃত বাচ্চা হচ্ছে — এইসব। এর কোন মানে নেই। মেয়েরা সেই সময় খুব আতঙ্কগ্রস্থ থাকে বলেই এ রকম স্বপ্ন দেখে।

' আমি জানি; আমি যা স্বপ্নে দেখেছি তাই হবে। আমার স্বপ্ন অন্য মেয়েদের স্বপ্নের মত নয়। সবাই যুক্তি করে আমার ছেলেটাকে মারবে।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তোমার কোলে যখন ফুটফুটে একটা বাচ্চা দিয়ে দেব তখন তুমি বুঝবে যে, কত মিথ্যা সন্দেহ তোমার মধ্যে ছিল।

মেয়েটার চোখ চিক্‌চিক্ করতে লাগল। সে গাঢ় স্বরে বলল, সত্যি তুমি তাই করবে?

'অবশ্যই।'

'তাহলে তুমি প্রতিজ্ঞা কর। কোরান শরীফ ছুঁয়ে বল, তুমি বাচ্চাটাকে মারবে না। ওরা যখন মারতে চাইবে তুমি মারতে দেবে না। তুমি ফেরাবে।'

'একটা শিশুকে আমি খুন করব এটা তুমি কি বলছ?'

'তুমি কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।'

'কোরান শরীফ এখানে পাবো কোথায়?'

'আমার সঙ্গে আছে। আমার ঐ কালো ব্যাগটার ভেতর। আমি নিয়ে এসেছি।'

রোগিকে শান্ত করবার জন্যেই প্রতিজ্ঞা করতে হল। রোগি শান্ত হল না। তার অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। সে চাপা গলায় বলল, আমি জানি তুমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারবে না। যদি না রাখ তাহলে আমার অভিশাপ লাগবে। আমি তোমাকে একটা কঠিন অভিশাপ দিচ্ছি।

মেয়েটি সত্যি সত্যি একটা কঠিন অভিশাপ দিয়ে বসল। মেয়েটার মাথার যে ঠিক নেই, সে যে অসুস্থ একটি মেয়ে তার আরেকটি প্রমাণ পেলাম। তবে তার এই অসুস্থতা, এই মানসিক যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। একটি হাসি-খুশি শিশু তার সমস্ত কষ্ট ভুলিয়ে দেবে।

সব কিছুই ঠিকঠাক মত চলছিল।

রাত দুটায় বাইরের দুজন পুরুষ ডাক্তার এলেন। ডেলিভারির সময় এরা থাকবেন। এঁদের মধ্যে একজন আমার পরিচিত। ডাক্তার সেন। বড় ডাক্তার এবং ভাল ডাক্তার।

আমাদের রোগিনী নতুন ডাক্তার দুজন দেখেই আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমার হাত ধরে ফিস ফিস করে বলল, এরা কারা? এরা আমার বাচ্চাকে খুন করবে।

আমি বললাম, তুমি নিশ্চিন্ত থাক — আমি সারাক্ষণ এখানে থাকব। এক সেকেণ্ডের জন্যে নড়ব না। তাছাড়া ডাক্তার সেনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তাঁর মত ডাক্তার কম আছে।

'মনে থাকে যেন তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ।'

'আমার মনে আছে।'

'প্রতিজ্ঞা ভাঙলে আমার অভিশাপ লাগবে।'

'আমার মনে আছে।'

তার কিছুক্ষণ পরই ভদ্রমহিলার স্বামী আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। খুবই অল্পবয়স্ক একজন যুবক। তাকে বেশ ভদ্র ও বিনয়ী মনে হল। তবে যেকোন কারণেই হোক তাকে বেশ ভীত বলে মনে হচ্ছিল। ভদ্রলোক নরম স্বরে বললেন, আপা, আমার স্ত্রী সম্ভবত আপনাকে কিছু বলেছে। আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। ও এসব কেন যে বলছে কিছু বুঝতে পারছিনা। আমাদের বাচ্চাটা সংসারের প্রথম সন্তান। আমি আমাদের পরিবারের বড় ছেলে অথচ ওর ধারণা ....

আমি ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করবার জন্যে বললাম, আপনি এসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবেন না।

'সব ঠিকঠাক আছে তো আপা?'

'সব ঠিক আছে।'

'সিজারিয়ান লাগবে না?'

'না — নরম্যাল ডেলিভারি হবে। তাছাড়া ডাক্তার সেন এসেছেন। উনি খুবই বড় ডাক্তার এবং হাইলি স্কিলড।'

'তাহলে আপনি বলছেন সব ঠিকঠাক হবে?'

'হ্যাঁ।'

রাত তিনটার পর থেকে দেখা গেল সব কেমন বেঠিক চলছে। বাচ্চা নেমে এসেছে বার্থ চ্যানেলের মুখে। এই সময় ডাক্তার সেন বললেন, বাচ্চার পজিশন তো ঠিক নেই। মাথা উপরের দিকে। এতক্ষণ তোমরা কি মনিটর করছ'?

আমিও দেখলাম — তাই। এরকম হওয়ার কথা নয়। কিছুক্ষণ আগেই সব পরীক্ষা করা হয়েছে। আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে লাগল। এই সময় এত রক্তপাতের কোনই কারণ নেই। টকটকে লাল রঙের রক্ত — যা ধমনী থেকে আসছে। সমস্যাটা কোথায়'?

ব্লাড ক্রস ম্যাচিং করা ছিল — রক্ত দেয়া শুরু হল, কিন্তু এটা সমস্যার কোন সমাধান নয়। মনে হল রোগিনী বাইরের রক্ত ঠিক গ্রহণ করতে পারছে না।

ডাক্তার সেন গম্ভীর গলায় বললেন, সামথিং ইজ ভেরি রং। আমাদের সবার গা দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। ডাক্তার এসব কি বলছেন'?

কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় সমস্যা দেখা দিল — হঠাৎ করে কনট্রেকশান বন্ধ হয়ে গেল। অথচ এই সময়ই কনট্রেকশান সবচে' বেশি প্রয়োজন। শিশুটি কি বার্থ চ্যানেলে মারা গেছে?

রোগিনী ফিসফিস করে বলল, আমার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

ডাক্তার সেন ফোরসেপ ডেলিভারির প্রস্তুতি নিলেন। আর তখন ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। আজকাল বাতি চলে গেলেই ইমার্জেন্সি বাতি জ্বলে ওঠে — তখনকার অবস্থা তা ছিল না। তবে আমাদের কাছে টর্চ, হ্যাজাক, মোমবাতি সব সময় থাকে। সমস্যার সময় ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়া কোন নতুন ঘটনা নয় — কাজেই প্রস্তুতি থাকবেই। দ্রুত হ্যাজাক জ্বালান হল।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরিশ্রম করে ডাক্তার সেন ডেলিভারি করালেন — যে জিনিসটি বেরিয়ে এল আমরা চোখ বড় বড় করে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

কুৎসিত কদাকার একটা কিছু যার দিকে তাকান যায় না। এ আর যাই হোক মানবশিশু নয়। চেনা-জানা পৃথিবীর সাথে তার কোন যোগ নেই। ঘন কৃষ্ণবর্ণের একতাল মাংসপিণ্ড। এর থেকে হাতির শুঁড়ের মত আট-দশটি শুঁড় বেরিয়ে এসেছে। শুঁড়গুলো বড় হচ্ছে এবং ছোট হচ্ছে। তালে তালে মাংসপিণ্ডটিও বড়-ছোট হচ্ছে। মানবশিশুর সঙ্গে এর একটিমাত্র মিল — এই জিনিসটিরও দুটি বড় বড় চোখ আছে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে দেখছে চারদিকের পৃথিবীকে। চোখ দুটি সুন্দর কাজল-টানা। ডাক্তার সেন হতভম্ব গলায় বললেন, হোয়াট ইজ দিস'? ফোরসেপ দিয়ে ধরা জন্তুটাকে তিনি মাটিতে ফেলে দিলেন। মেঝেতে সে কিলবিল করতে লাগল। মনে হচ্ছে শুঁড়গুলিকে পায়ের মত ব্যবহার করে সে এগুতে চাচ্ছে। আমার সঙ্গের সহকর্মী হঠাৎ পেটে হাত দিয়ে বমি করতে শুরু করল।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে রোগিনীর জ্ঞান নেই। জ্ঞান থাকলে এই ভয়াবহ দৃশ্য তাকে দেখতে হত।

ডাক্তার সেন বললেন, কিল ইট। এক্ষুনি এটাকে মেরে ফেলা দরকার।

জন্তুটি কি মানুষের কথা বুঝতে পারে? ডাক্তার সেনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র ও তীক্ষ্ণ শব্দ বের হয়ে এল। অত্যন্ত হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড যা মানুষের স্নায়ুকে প্রচন্ড ঝাঁকি দেয়।

ডাক্তার সেন বললেন, অপেক্ষা করছেন কেন? কিল ইট।

জন্তুটি এগুতে শুরু করেছে। শুঁড়গুলো বড় হচ্ছে। আর সে এগুচ্ছে তার মার দিকে। আমরা দেখছি, সে মেঝে বেয়ে বেয়ে তার মার খাটের দিকে যাচ্ছে — খাট বেয়ে উপরে উঠছে। আশ্রয় খুঁজছে মা'র কাছে। যেন সে জেনে গেছে এই অকরুণ পৃথিবীতে একজনই শুধু তাকে পরিত্যাগ করবে না।

ডাক্তার সেন বললেন, আপনারা অপেক্ষা করছেন কেন? কিল ইট।

আবার আগের মত শব্দ হল। জন্তুটি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডাক্তার সেনের দিকে। তার চোখ দুটি মানুষের চোখ। সেই চোখের ভাষা আমরা জানি। সেই চোখ করুনা এবং দয়া ভিক্ষা করছে। কিন্তু করুনা সে আমাদের কাছ থেকে পাবে না। আমরা মানুষ। আমরা আমাদের মাঝে তাকে গ্রহণ করব না। এই ভয়ঙ্কর অসুন্দর ও কুৎসিতকে আমরা আশ্রয় দেব না। সে পশু হয়ে এলে ভিন্ন কথা ছিল। সে পশু হয়ে আসে নি। মানুষের সিঁড়ি বেয়ে এসেছে।

ডাক্তার সেন বললেন, এই জন্তুটিকে যে মেরে ফেলতে হবে এ বিষয়ে কি আপনাদের কারো মনে কোন দ্বিধা আছে?

আমরা সবাই বললাম — না, আমাদের মধ্যে কোন দ্বিধা নেই।

আত্মীয়-স্বজনদের মত নেয়া উচিত?

আমরা বললাম — না, আমরা তাও মনে করি না।

যে লোহার দণ্ডটি থেকে স্যালাইন ওয়াটারের ব্যাগ ঝুলছিল আমি তা খুলে হাতে নিলাম। জন্তুটি এখন তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কি সুন্দর বড় বড় শান্ত চোখ! কি আছে ঐ চোখে? ঘৃণা, দুঃখ, হতাশা? জন্তুটি খাটের পা বেয়ে অর্ধেক ওঠে গিয়েছিল। সেখানেই সে থেকে গেল। বোধ হয় বুঝতে পেরেছে আর ওঠে লাভ নেই।

প্রথম আঘাতটি করলাম আমি।

সে অবিকল মানুষের মত গলায় ডাকল — মা! মা!

তার মা সাড়া দিল না।

আমরা দেখছি একটি দানবকে। সেও তার করুন চোখে একদল দানবকেই দেখছে।

আমার হাত থেকে লোহার রডটি পড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার সেন তা কুড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। হত্যাকাণ্ডে বেশি সময় লাগল না।

ডাক্তার হাসনা বেগমকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই ঘটনার কি কোন ব্যাখ্যা আপনি দাঁড় করাতে পারেন?

ডাক্তার হাসনা ক্লান্ত গলায় বলেছিলেন — আমার কাছে কোন ব্যাখ্যা নেই। তবে এই ঘটনার প্রায় সাত বছর পর আমেরিকান জার্নাল অব মেডিক্যাল সোসাইটিতে এরকম একটি শিশুর জন্ম-বৃত্তান্তের কথা পাই। শিশুটির জন্ম হয়েছিল বলিভিয়ার এক গ্রামে। শিশুটির বর্ণনার সঙ্গে আমাদের জন্তুটির বর্ণনা হুবাহু মিলে যায়। ঐ শিশুটিকেও

জন্মের কুড়ি মিনিটের মাথায় হত্যা করা হয়। এবং রিপোর্ট অনুসারে সেও মৃত্যুর আগে ব্যাকুল হয়ে বলিভিয়ান ভাষায় মাকে কয়েকবার ডাকে।

'আপনার কাছে কোন ব্যাখ্যা নেই?'

'না। তবে আমার একটা হাইপোথিসিস আছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রকৃতি ইবোলিউশন প্রক্রিয়ায় হয়ত নতুন কোন প্রাণ সৃষ্টির কথা ভাবছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। আমরা প্রাণপণে সেই প্রক্রিয়াকে বাঁধা দিচ্ছি।'

'আপনার ধারণা এ রকম ঘটনা আরো ঘটবে?'

'হ্যাঁ। প্রকৃতি সহজে হাল ছাড়ে না। সে চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং সে লক্ষ্য রাখবে যাতে ভবিষ্যতে আমরা বাঁধা দিতে না পরি। ঐ যে মা আগে স্বপ্ন দেখলেন তার একটিই ব্যাখ্যা — প্রকৃতি শিশুটি রক্ষার চেষ্টা করছে। এক ধরনের প্রোটেকশান দেবার চেষ্টা করছে। এখন সে পারছে না, তবে ভবিষ্যতে সে নিশ্চয়ই আরো কোন ভাল প্রোটেকশানের ব্যবস্থা করবে।'

'আপনি কি আপনার হাইপোথিসিস বিশ্বাস করেন?'

ডাক্তার হাসনা বানু জবাব দিলেন না। তাঁর কাছে এই প্রশ্নের জবাব নেই। জবাব থাকার কথাও নয়। কিছু কিছু সময় আসে যখন আমরা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সীমারেখায় বাস করি। তখন একইসঙ্গে আমরা দেখতে পাই ও দেখতে পাই না। বুঝতে পারি ও বুঝতে পারি না। অনুভব করি এবং অনুভব করি না। সে বড় রহস্যময় সময়!
